শ্রাবণ ভাদ্র—১৩৮৭ জুলাই-আগস্ট—১৯৮০

# সায়েন্সফিকসান

*ডিটেকটিভ*

*রহস্য*

*গোয়েন্দা*

*ভূত*

# বেতালের মতো কমিকস

*রোমাঞ্চ*

*অলৌকিক ও ভৌতিক*

# কাহিনীর

বহু পৃষ্ঠায় সুন্দর প্রচ্ছদ নিয়ে

পূজা সংখ্যা

সেপ্টেম্বর মাসেই

# সংখ্যাটি সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ

ছোটদের রচনা ও আলোকচিত্র সম্ভারে আধুনিক-কালের আস্বাদ দুর্নিবার আকর্ষণ করবে।

শ্রাবণ | ভাদ্র
১৩৮৭

# চিল্ড্রেন্স ডিটেকটিভ

জুলাই | আগষ্ট
১৯৮০

সর্বভারতীয় বাংলা মাসিক পত্রিকা

: সম্পাদক :
মহীন্দ্র বসু

প্রচ্ছদ | সন্দীপ রায়

: উপদেষ্টা সম্পাদক :
প্রণবেশ চক্রবর্তী

রহস্য, রোমাঞ্চ, ভৌতিক
ভিত্তিক ছোটদের জগতে
একমাত্র পত্রিকা।

: সার্কুলেশন ম্যানেজার :
রবীন মুখোপাধ্যায়

—: সম্পাদকীয় দপ্তর :—
২৬, স্ট্রাণ্ড রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন : ২২-২৭৭০ ২২-৫২৮০ ২২-৩৮৪৭

চতুর্থ বর্ষ ★ চতুর্থ/পঞ্চম সংখ্যা

## যা পাবে

**কবিতা**
আম—চিল—টিল ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র ৯

**বড় গল্প**
আঁচল ॥ সুহাস চৌধুরী ১০

**উপন্যাস**
বকখালির রহস্য ॥ শ্যামল বসু ২৫

**ছোট গল্প**
এই টুকুন ॥ বিমল ভূষণ ১৭
বিমান ভ্রমণ ॥ নিরঞ্জন হালদার

**ধারাবাহিক উপন্যাস**
বলটুদার গোয়েন্দাগিরি ॥ আশা দেবী ২৩

**বিদেশী গল্প**
বানরের থাবা ॥ বাবু মুখোপাধ্যায় ২৭

**বড় গল্প**

কণা বসু মিশ্র ॥ বুদ্ধুর অবিষ্কার ৩

**ফিচার**

সোহিনী পাল ॥ মনে রেখো ২৮

সলিল চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার নিচ্ছে সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায় ৮

**কমিকস্‌**

কথা | জরাসন্ধ

ছবি | প্রদীপ দাশ

বলতো কি ছবি আঁকা ৩২

**দাম : ১·৫০ পয়সা**

---

আগামী সংখ্যায় তোমাদের পাতা এবং গোয়েন্দা খুড়ো থাকবে।

---

# বুদ্ধুর আবিষ্কার

কণা বসু মিশ্র

ঠাকুমা রোজই বলেন, "বুদ্ধু, এই ঝাল চানাচুর, আর আচার খেয়ে খেয়ে তোর লিভারটা এবার সত্যি খারাপ হবে।" বুদ্ধু ঘুড়ির সুতোয় মাঞ্জা দিতে দিতে বলে, "আচ্ছা ঠাকুমা, তুমি আমায় একথা রোজই কেন বল বলতে পার?" ঠাকুমা পান চিবোতে চিবোতে বলেন, "বলি তোর রকম-সকম দেখে। এই যে আমি ছাদের রোদে আচার দিই, তার অর্ধেকই তো যায় তোর পেটে। ভাঁড়ার ঘরের আলমারির থেকে চানাচুরের শিশিটা প্রায়ই খালি হয়ে যায়। তুই না খেলে এগুলো যাবে কোথায়? ম্যাজিক নাকি?"

বুদ্ধুর হাতে পায়ে তখনো একগাদা ধুলো বালি। এই তো সবে বল খেলে এলো। ওদের টিম আজ বিচ্ছিরি রকম হেরে গেছে। তাই মনটা একেই খারাপ, তারপর আবার ঠাকুমার এই কথা শুনলে কি করে মেজাজ ভালো থাকে? ও সাপের মত ফোঁস করে ওঠে। বলে, "আমি ছাড়া কি খাবার লোক নেই নাকি?" "কে আছে।" খানিকটা জর্দা মুখে ফেলে দিয়ে ঠাকুমা তাকান, "আমি, তোর মা, তোর বাপ, আর তোর ওই ছোট্ট বোনটি। তা বোনটির বয়েস তো সবে ছ'মাস। বিছানায় শুয়ে খেলে। সে তো আর আলমারী খুলে চানাচুর খেতে পারে না? তোর বাপ তো গ্যাস্ট্রিকের রুগী। সে তো ও-সব খায়ই না। বাকী থাকে আমি আর তোর মা। আমরা যদি খাই তো সোজাসুজি নিয়েই খাব।" বুদ্ধু বলে, "আমিও তো তোমাদের সামনে নিয়েই খেতে পারি।"

"না, তুমি খেতে পার না। আমরা তোমায় যদি বকি, তাই তুমি লুকিয়ে রোজ সব ফাঁক করে দাও।" "আহ্, ঠাকুমা। বুদ্ধু এবার প্রায় কেঁদেই ফেলে। বলে, "চানাচুরে ঝাল না? আর আচারে তো টক্, আমার কোনটাই ভাল লাগে না। আমি কি ঝাল খেতে পারি?"

"পারো না বুঝি?" মা রান্নাঘর থেকে ফোড়ন কাটেন। "ধোসা, চপ এসব খেতে তো ওস্তাদ।"

"কি মুস্কিল। ধোসা, চপ আর চানাচুর কি এক জিনিস?" মা ফের বলেন, "অত চ্যাঁচাবি না বলছি। কেবল মিথ্যে কথা। কালও তো দেখলাম, দুপুরে ছাদে গিয়ে তুই কি যেন খাচ্ছিস আঙুল চেটে চেটে।"

"ওহ্! সে কি আচার? সে তো হজমি। স্কুলের সামনে যে হজমিওয়ালাটা হজমি বিক্রী করতে আসে, আমি তো তার কাছ থেকে কিনেছিলাম।"

"পয়সা পেলি কোথায়?"

"ঠাকুমা দিয়েছিল রথের মেলার দিন।"

"মা, আপনি, ওর হাতে আবার পয়সা দিয়েছেন?" মা অনুযোগের সুরে বলেন ঠাকুমাকে।

ঠাকুমা অপরাধীর মত মুখ করে বলেন, "ওই আর কি।" নিজের দোষ ঢাকবার জন্যে, তার পরেই

বলেন, "সে তো ওর খেলনা কেনার জন্যে দিয়েছিলাম। তাই বলে হজমি খাবার জন্যে তো আর দিইনি।"

"হজমি না হাতী। ও ওই আচারই খাচ্ছিল সেদিন। আমায় দেখতে পেয়েই তাড়াতাড়ি হাতটা লুকিয়ে ফেলে বোঁ বোঁ দৌড়।"

"মা মিথ্যে কথা বলবে না বলছি। আমি আচার খাইনি। আচার টক, আচার ঝাল। আচার খেলে আমার চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়ে। তোমরা শুধু ঝাল আচার বানাও।" এতগুলো কথা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলেই বুদ্ধু ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে। ফুটবল ম্যাচে হেরে যাবার পাথর চাপা কষ্টটাও ওই একই সঙ্গে কান্না হয়ে ফেটে পড়ে।

সেই মুহূর্তেই বাবা ফেরেন অফিস থেকে। জুতো খুলতে খুলতে উনি বলেন, কিরে বুদ্ধু কি হয়েছে?"

বুদ্ধু কেঁদে বলে, "মা, ঠাকুমা সবাই বলছে, আমি নাকি রোজ আচার, চানাচুর চুরি করে খাই। আমি ওসব খাই না, বাবা।" কথা শেষ করেই ওর আর এক দফা কান্না।

বুদ্ধুর বাবা ওকে কাছে ডেকে পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, "তুই এখন ক্লাশ থ্রিতে পড়িস। এতবড় ছেলে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদছিস? ওদের বলে দে, খাবার জিনিস খেয়েছি বেশ করেছি।"

বুদ্ধু কেঁদে কেঁদে বলে, "কেন আমি বলব? আমি তো আর সত্যি খায়নি। তুমিই তো বলেছ বাবা, কখনও মিথ্যে কথা বলতে নেই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশাই লিখেছেন, "সদা সত্য কথা বলিবে।" এবার বাবা হো হো করে হেসে ওঠেন। "তাই তো, কেন মিথ্যে কথা বলবি তবে?"

পরদিন আবার সেই একই কাণ্ড। আচার চুরি। চানাচুর চুরি। ঠাকুমা সকাল আটটা নাগাদ ছাদে গিয়ে আচার রেখে এসেছেন। দুপুরে গিয়ে দেখেন অনেকটাই নেই। "কি আশ্চর্য, এ যে পরিষ্কার কারো আঙুলে করে তুলে নেবার দাগ। বুদ্ধু তো এই সবে এল স্কুল থেকে। এরই মধ্যে আবার নেওয়া হয়ে গেল তার?

এবার আর হাসি নয়। মা একেবারে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দিলেন। "বুদ্ধু তুমি রোজ আচার চুরি করে কেন মিথ্যে কথা বল? কেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে অপমান কর?"

আজ আর বুদ্ধু রাগ করে না, কাঁদেও না, মা, ঠাকুমার কথায়। আজ ওদের দল দু' গোলে জিতেছে। তাই মনটা বড্ড খুশি খুশি। স্কুল বসার আগে প্রার্থনার সময় ওরা যে গানটা গায়, "বিপদে মোরে রক্ষা কর, সে নহে মোর প্রার্থনা..." সেই গানটা গুন্ গুন্ করে গাইতে গাইতে বুদ্ধু ঠাকুমাকে বলে, "দেখি, তোমার আচারের বয়মটা।"

"কি আবার দেখবি? তুই তো চুরি করেই খেয়েছিস।" ঠাকুমা কাঁদো কাঁদো ভাবে বলেন, "মুখে অরুচি, কিছু খেতে ইচ্ছে করে না, এই আচার দিয়েই দু গ্রাস ভাত খাই, তা তোর জ্বালায় খাবার উপায় নেই! ছোটবেলায় তোর বাবা ছিল অমনি দুষ্টু।...

বুদ্ধু কান দেয় না ঠাকুমার কথায়। ও তখন গভীর মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করছে আমের

ভেতরটা। কি দেখছে তা সেই জানে।

রাত্তিরে ঘুমোনোর সময় বুব্ধু ভাবছে, আচার চোরকে তার ধরতেই হবে।

আচারের বয়মটার মধ্যে ও পরিষ্কার দেখেছে, কতকগুলো আঙুলের দাগ। কোন ছোটমানুষের আঙুলের দাগ নয়। দাগগুলো রীতিমত বড় মানুষের আঙুলের। ইস! যদি একবার ফেলুদাকে পেত' না? হাতে নাতে চোর ধরে ফেলতে পারত'। ওদের খাওয়া পরার কাজের লোকটা এখন দেশে। ঠিকে ঝি সকাল আটটার আগেই কাজ সেরে চলে যায়। কাজেই ওকে দোষ দেওয়া যায় না। আচ্ছা, পাশের বাড়ির ছাদ থেকে লাফিয়ে যদি কেউ এ ছাদে আসে? পাশের বাড়ির ছাদটা থেকে ওদের বাড়ির ছাদের দূরত্ব কত? কি আশ্চর্য, রোজ দু'বেলা ছাদে যায়, আর এটাই খেয়াল করেনি ও? দুটো ছাদ যদি কয়েক হাত তফাতে হয়, তাহ'লে তো ওর ধারণাই সত্যি। ব্যাপারটা নিয়ে আর কিছু ভাববার থাকে না। সব ফয়সালা হয়ে যায়। কিন্তু যদি খুব দূরের হয়, দুটো ছাদের ব্যবধান, তাহ'লে তো ও বাড়ির ছাদ-কাদ নিয়ে আর মাথা ঘামানোর দরকারই নেই। ছাদের পাইপ বেয়ে কেউ ওপরে উঠে কি? নাহ্, সেও অসম্ভব। সামান্য আচার খাবার জন্যে এ কাজ কে করবে? অতখানি বুকের পাটা কজন আচার চোরের থাকে।

বুব্ধু ভাবে, ছাদে একবার উঠে গিয়ে দেখে এলে হয়, পাশের বাড়ির ছাদটা কত দূরে। এই একটা সাধারণ ব্যাপার এতদিন যে কেন ও খেয়াল করেনি! ঠাকুমার খাওয়া হয়ে গেছে। উনি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। মা পাশের ঘরে বসে বই পড়ছেন। বাবা এখনো ফেরেননি তাঁর তাসের আড্ডা থেকে।

ওই তো ওই আলমারীর ওপরেই রয়েছে, লোডশেডিংয়ের বড় টর্চ লাইটটা। এখন ও চুপি চুপি একবার ঘুরে আসবে নাকি ছাদে?

যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। কোন কাজ মাথায় এলে বুব্ধু চট্ করে না সেরে পারে না।

ছাদের ওপরের সিঁড়িতে টর্চের আলো ফেলতেই, বুব্ধুর মনে হয় কে যেন সরে গেল ছাদের দরজার সামনে থেকে। নিশ্চয় সেই চোরটা। কিন্তু এখন তো ছাদে আচার টাচার নেই। তবে আবার চোর কেন? তবে কি ভূত? হ'লেই বা। ভূতকে ভয় পায় না বুব্ধু। যারা বোকা, তারাই ভূতকে ভয় পায়। ভূত তো একটা ছায়া। ছায়া কি কাউকে ধরতে পারে?

"ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি, রামলক্ষ্মণ বুকে আছে, করাব আমার কি?" বুব্ধু মনে মনে বলে।

টর্চের আলোটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছাদের চারদিকে ছড়িয়ে দিতেই ও দেখে, সাদা কাপড় পরে কে যেন পাঁচিল ধরে দাঁড়িয়ে। ও কে ভূত? ভূত নাকি মানুষ হ'য়ে যেতে পারে কখনো কখনো। কিন্তু ওদের ছাদে দাঁড়িয়ে থেকে শ্রীমান ভূতের কি লাভ? বুব্ধু কোনদিন ভূত দেখেনি। বুব্ধুর খুব সখ ভূত দেখার।

কে? কে ওখানে?

সাদা কাপড় পরা মানুষটা ঘুরে তাকান। বুদ্ধু অবাক হয়ে বলে, "কি ব্যাপার ঠাকুমা তুমি?" "তুইই বা এত রাত্রে ছাদে কেন?"

বুদ্ধু হেসে বলে, "আমি এলাম একটা কারণে। কিন্তু তুমি কেন এসেছ বলত?"

"ঘুম আসছে নারে বুদ্ধু। কে আমার আচার রোজ অমন করে খেয়ে যায় বলত? আচার যদি রোদে না দিই তাহলে তো খারাপ হয়ে যাবে। আর রোদে দিলেই তো কে খেয়ে ফেলবে।"

এবার ঠাকুমার সঙ্গে বেশ কৌতূহল হয় বুদ্ধুর। ঠাকুমা বলেন, "ছাদটা ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম, নীচে থেকে পাইপ বেয়ে অন্য কেউ আসে কিনা।"

"চমৎকার বুদ্ধি তোমার ঠাকুমা। আমিও তো এতক্ষণ তাই ভাবছিলাম। কিন্তু সেটা মনে হয় সম্ভব নয়, দিনের বেলা পাইপ বেয়ে কে উঠবে বল? কার এত সাহস?" "তাই তো।" ঠাকুমা মাথা দোলান।

"আমি বরং ভাবছিলাম, জানলে ঠাকুমা! পাশের বাড়ির ছাদ থেকে কেউ লাফিয়ে আসে না তো?"

ঠাকুমা ঘাড় নাড়িয়ে বিজ্ঞের মত বলেন, "তা হতে পারে। দুটো ছাদ তো একেবারে প্রায় গায়ে গায়ে লাগা। তাই হবে রে বুদ্ধু, অন্য বাড়ির কাজের লোক-টোক হয়ত লাফিয়ে আসে আর কি। কি কাণ্ড বল দিকিনি।"

বুদ্ধু বলে, ঠাকুমা কাল থেকে আচারটা ভেতরের বারান্দায় রোদে দিলে হয় না?

"রোদ তো খুব বেশী আসে নারে ওখানে। কি আর করা যাবে, তাই দিতে হবে।"

"আচ্ছা, ঠাকুমা।" বুদ্ধুর এবার মনে পড়ে চানাচুরের কথা। বুদ্ধু বলে, "তুমি না বলছিলে চানাচুরও কে খেয়ে ফেলে?" "না তাও তো খায়।"

"আচারটা না হয় বাইরের চোর খেল, চানাচুরটা তো ঘরের চোরই খাবে।"

ঠাকুমা যোকলা দাঁতে হেসে ফেলেন, "ওটা তুই-ই খাস।"

"ঠাকুমা তুমি বিশ্বাস করছ না?" বুদ্ধু যত বলে ঠাকুমা তত হাসেন।

রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বুদ্ধু ফের ভাবে, কি করে চোর ধরা যায়? কিরিটি রায়, ফেলুদা, সবাই ওর মাথার মধ্যে এক সঙ্গে ভেল্কী দেখায়।

সকালে ঠাকুমা রোদে আচারের বয়ম রাখার সময় বাবা হঠাৎ রেগে গিয়ে বলেন, "তোমরা যে কি না, সামান্য আচার নিয়ে হই হই কাণ্ড বাধিয়েছ।" এই বারান্দায় পিঁপড়ে টিপড়ে হবে, যাও বয়ম ছাদে রেখে এস।"

ঠাকুমা অসহায়ভাবে বুদ্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে বয়মটা ছাদে নিয়ে যান।

বুদ্ধু তখন স্কুলে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছে। আর একটু বাদেই স্কুলের বাস আসবে চৌরাস্তার মোড়ে। বুদ্ধু এক নজর তাকায় ওর বাবার মুখের দিকে। বাবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাচ্ছেন বেসিনের সামনের আয়নায়। বুদ্ধু জুতো পরছে খানিকট দূরে। কিন্তু ও আন্দাজেই জুতোর ফিতে বাঁধছে। ওর চোখ দুটো গোয়েন্দার মত তাকিয়ে আছে বাবার হাতের আঙুলের দিকে। যদি বাবার আঙুলের ছাপ নিতে পারত বুদ্ধু!

বাবার মুখ চোখ বাবার আঙুল সারাদিনই বুদ্ধুর মনের মধ্যে ঘুরপাক খায়। দুপুর বেলা স্কুল থেকে ফিরেই ও সোজা দৌড়ে যায় ছাদে। না, আজ আর ছাদে কোন ঘটনা ঘটেনি। ঠাকুমা বললেন, "আচারটা রোদে দেওয়ার পর থেকে তো আমি কড়া পাহারাদার রেখেছিলাম, ওই ঠিকে কাজের লোকের মেয়েটাকে। সে এইমাত্র বাড়ি গেল।"

বিকেলে মেয়েটি ওর মায়ের সঙ্গে কাজে এলে, বুদ্ধু ওকে উকিলের মত প্রথমেই জেরা করে, "হ্যাঁরে, তুই যখন ছাদে ছিলি, তখন পাশের বাড়ির কোন লোককে দেখেছিলি?"

"না।"

"আমাদের ছাদে কাউকে আসতে দেখেছিলি?"

"না।"

"আমার বাবা, মা, ঠাকুমা কেউ এসেছিল ছাদে?"

"মা, ঠাকুমা আসেন নি। তবে বাবু এসেছিলেন একবার সকালের দিকে।"

"তোকে কিছু বলেন নি?"

"আমাকে সিগারেট আনতে বললেন দোকান থেকে।"

"তুই আনতে গেছলি?"

"না, ঠিক তখুনি বাবুর অফিসের গাড়ি এসে গেল। হরন্ মারল। বাবু তাড়াতাড়ি নেমে গেলেন ছাদ থেকে। বললেন, "দরকার নেই।"

কোমরে হাত রেখে বুদ্ধু একটু মুচকি হাসে।

মা, ঠাকুমা, ঘুমিয়ে পড়েছেন। বাবা পাশের ঘরে অনেক রাত অবধি জেগে জেগে পড়াশুনা করেন। বুদ্ধুর ঘুম ভেঙে যায়। এইমাত্র ও স্বপ্ন দেখেছে, আবার চোর, চানাচুর চোর ধরা পড়েছে। কিন্তু স্বপ্নটা এত অস্পষ্ট যে চোরটাকে বুদ্ধু চিনতে পারেনি। ও এত উত্তেজিত হয়েছে যে, ঘুমের মধ্যেই ওর গলা শুকিয়ে কাঠ। পাশের খাটেই মা শুয়ে আছেন। "মা, মা," বলে বুদ্ধু ডাকে। কিন্তু গলা দিয়ে ছাই আওয়াজ বেরোয়? মায়ের ঘুম ভাঙে না। আড়মোড়া ভেঙে উঠে পড়ে বুদ্ধু। খাবার ঘরের কুঁজোয় জল আছে। ও নিজেই জল গড়িয়ে খেতে যায়।

"এ কি বাবা ওখানে কেন?" চোখ রগড়ে বুদ্ধু দেখে, হ্যাঁ বাবাই তো। কুট কুট করে দাঁতে ভাঙছেন বাবা চানাচুরের বাদামগুলো। ওঁর হাতে তখনো রয়েছে চানাচুরের কৌটোটা।

"চোর চোর। ঠাকুমা চোর ধরেছি দেখবে এসো"

দুষ্টুমীর হাসি হেসে বাবা বলেন, "ছাড়, ছাড়।" ততক্ষণে ঠাকুমা ও মা উঠে এসেছেন। বুদ্ধু হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, "কি ঠাকুমা, তোমার ছেলেকে এবার কি শাস্তি দেবে বল?"

বড় বড় চোখ করে মা বাবাকে বলেন, "তোমার না গ্যাসটিক? শুধু শুক্তোর ঝোল, মাছের ঝোল খাবার কথা তোমার?"

ঠাকুমা হাসতে হাসতে বলেন, "ওরে দুষ্টু ছেলে তোমায় কি আমি ছোটবেলার মত আবার শাসন করব?"

মজা পাওয়া চোখে বুদ্ধু তাকিয়ে থাকে, ওর মজার বাবার মুখের দিকে।

# সলিল চৌধুরীর

# সাক্ষাৎকার

# নিচ্ছে

# সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়

**প্রশ্ন ১।** আপনি পশ্চিমবাংলা তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুরকার। গীতিকার কবি এবং সাহিত্যিক হিসেবেও খ্যাতিমান। ছোটদের ডিটেকটিভ রচনা সম্পর্কে আপনার কি বক্তব্য ?

**উত্তর :** বিশেষ কোনো বক্তব্য নেই। তবে যে কাহিনী ছোটদের সৎ এবং মহৎ হতে উৎসাহিত করে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার সাহস এনে দেয়, তার প্রতি আমার সমর্থন আছে।

**প্রশ্ন ২।** আপনি অনেক বিখ্যাত ডিটেকটিভ সিনেমায় সুর দিয়েছেন। এই ধরনের সিনেমার জন্য কি বিশেষ ধরনের সুর হওয়া উচিৎ ?

**উত্তর :** সে সব ছবিই হিন্দী এবং কোনোটাই শুধু ছোটদের জন্যে নয়। ডিটেকটিভ ছবির জন্য আলাদা কোনো সুর সৃষ্টি করতে হয় কি না ; এ প্রশ্নটা Vague যে কোনো রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার মুহূর্তে সঙ্গীত পরিচালককে ভাবতে হয় দু'দিক থেকে। একটি হল দর্শকের দিক অন্যটি Criminal এর দিক মানে Perspective বলতে যা বোঝায় তাই। যে কোনো Suspense Films-এর সুর নির্ভর করে তার বিষয়বস্তুর ওপর। ছবির পরিচালক কি ভাবে ঘটনার পর ঘটনা সাজান, তার ওপর নির্ভর করে সুরের আঙ্গিক বা Style বা Composition।

**প্রশ্ন ৩।** 'চিলড্রেনস্ ডিটেকটিভ' পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা পড়েছেন বোধ হয়। আপনার মতামত পেলে আমাদের পাঠকরা আনন্দিত হবে।

**উত্তর :** পত্রিকার নামকরণে আমার আপত্তি আছে। বাংলা পত্রিকার ইংরিজী নাম কেন ? এই পত্রিকায় যে সব তরুণেরা জড়িত, তাদের নিঃস্বার্থ সাহিত্যপ্রীতি আমার ভাল লেগেছে। 'ফেলুদা' সংখ্যাটি ভাল। মানিকদার লেখার মূল্যায়ণ হওয়া প্রয়োজন। তবে ছোটদের পক্ষে একটু কঠিন নয় কি এটা ?

**প্রশ্ন ৪।** এই ধরনের পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আপনার মনে হয় ?

**উত্তর :** যে কোনো ছোটদের পত্রিকা যার প্রধান লক্ষ্য যদি সাহিত্য সৃষ্টি হয়, তাহলে নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে।

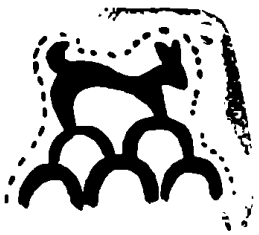

# আম—ঢিল—ঢিল

প্রেমেন্দ্র মিত্র

গাছের ডালে আম ছিল, আর
আমার হাতে ঢিল ছিল।
ঠিক তখনই মাথার ওপর
দূর আকাশে চিল একটা উড়ছিল।

হঠাৎ হ'ল কি?
হাত ফস্‌কে ঢিলটা গেল ছুটে,
আম'ত নয়ই,
পারল না'ক পাড়তে একটা আমলকি।

আমটা যেমন ছিল, তেমনি
ঝুলে রইল ডালে,
চিলটা যেমন দিচ্ছিল, ঠিক
দিয়ে চলল চক্কর সেই চালে।

ঢিলটা শুধু পড়ল এসে
আমারই কপালে
বানিয়ে ক্ষুদে ঢিবি,
আর দেখিয়ে দুটি চোখে
সর্ষে ফুলের হলুদ হিবিজিবি।

এই ছড়াটির নীতিবচন এই কি?
চিল দেখলে আম পাড়তে
ঢিল ছুড়তে নেই কি?

# ॥ আঁচল ॥

সুহাস চৌধুরী

এক

তখন বম্বের জস্‌লোক-হস্‌পিটালের ঠিক উল্টো দিকের উঁচু জমির ওপর ফ্ল্যাটবাড়ি তৈরী শুরু হয়েছে।

ঐ টিলার ওপর থেকে আমাদের কনভার্টিবল্ বুইক গড়িয়ে গড়িয়ে বড় রাস্তায় পড়ার পরেও আমার দু'চোখ তন্দ্রায় ঢুলুঢুলু। ভোর পাঁচটাও বাজেনি তখন।

রোজকার মতন আমি আর শিবনাথ পেডার রোড পেরিয়ে জুহু সী-বীচে চলেছি বেড়াবো বলে। ঐ এলাকায় হেঁটে বেড়াবার বা 'জগিং' করার জায়গা কোথায়? অথচ শিবনাথের ছোড়দা ডক্টর নিখিল মিত্রের কড়া হুকুম, শরীর সারাতে হলে ভোরে বেড়ানো 'ইজ আ মাস্ট'। উনি আর উমা-বৌদি আলাদা যেতেন অন্য কোথাও নিজেদের ফিয়াটে। প্রতিদিন যে জুহু সমুদ্রতীরে আমরা যেতাম তা না। কখনও শিবাজী পার্ক, যাত্রা, পালি হিলস্ খার,—যেখানেই ফাঁকা নিরিবিলি, সে দিকেই নিখিলদার ড্রাইভার বাহাদুর আমাদের নিয়ে গিয়েছে।

সেদিন সকালে জুহুর দিকেই যাচ্ছিলাম। পেডার রোড, ওর্‌লি ছেড়ে চলে যাবার পর শিবনাথের কনুইয়ের ধাক্কায় আমি ঘুম চোখ মেলে তাকালাম।

শিবনাথ বলল: কি রে অমল? ঘুমুচ্ছিস নাকি?

হেসে বললাম: না না, কেন বল্‌তো?

শিবনাথের ফিসফিস আওয়াজ কানে এল: এই অমল! আমাদের গাড়ির সামনে একটা ট্যাক্সি, তার আগে একটা সবুজ অস্টিন যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছিস?

আমি গলা উঁচু করলাম! হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। কি ব্যাপার বলতো?

আমার কথার জবাব না দিয়ে শিবনাথ বাহাদুর-কে বলে দিল ঐ সবুজ অস্টিনটার পিছু নিতে।

আমার বেশ অবাক লাগছিল। শিবনাথ এমনিতে লাজুক প্রকৃতির। স্বল্পভাষী। বাহাদুর কড়া মেজাজের মানুষ। তার ওপর সে বয়সে প্রৌঢ়। আমরা তখন বাচ্চা ছেলে। তবে, বাহাদুর আমাদের আদর আবদার শুনতো, স্নেহও করতো। শিবনাথের কথায় সে ট্যাক্সিটাকে ওভারটেক করে ঐ সবুজ অস্টিনের পাশে পাশে, কখনও পিছনে গাড়ি চালাচ্ছিল। এমন সময় শিবনাথ কিছুটা উত্তেজিত স্বরে বলল: 'অমল, অমল, ঐ অস্টিনের ভেতরটা ছাখ'।

আমি দেখলাম ঐ সবুজ গাড়ির সমুখেও একজন চালক আর পিছনে আমাদের বয়সী

জনাচারেক ছেলেমেয়ে ব'সে আছে। তখন শীতকালে বম্বেতে কুয়াশা দেখা যেত। অস্টিনের পিছনের জানালার কাঁচ তোলা। ঠিক স্পষ্ট কারো দেখা শক্ত ছিল।

বললাম: কি দেখব?

শিবনাথের তখনও উত্তেজিত স্বর। "ওদের মধ্যে মাঝখানে একজন মেয়ে বসে আছে দেখলি না? ঐ যে শাড়ির আঁচল উড়ছে?"

"হ্যাঁ, দেখছি!"

—"ভাল ক'রে ছাখতো, মেয়েটাকে চিনতে পারিস নাকি?" শিবনাথ যেন হাঁপাচ্ছিল।

স্পষ্ট মনে আছে পাশাপাশি যেতে যেতে আমি খুব চেষ্টা করেছিলাম মেয়েটার মুখটা দেখতে। ওদের গাড়ীর ড্রাইভারের খোলা জানালা দিয়ে হু হু বাতাস এসে এমন ভাবে মেয়েটার শাড়ির আঁচল উড়িয়ে দিচ্ছিল যে কারোর মুখই দেখতে পাচ্ছিলাম না। একবার যেন দেখেছিলাম মেয়েটির ফর্সা হাত আর গ্রীবা। তাও যেন এক পলকের দেখা। তারপর ডানদিকে আমাদের বুইক্ ঘুরিয়ে নিল বাহাদুর। ওদিকেই জুহুর পথ। সবুজ অস্টিন সোজা বেরিয়ে চলে গেল।

শিবনাথ বলল: দেখতে পাসনি না? কি ব্যাপার জানিস? পেডার রোডেই মেয়েটার মুখটা দেখে মনে হয়েছিল ও আমার দারুন চেনা। হয়ত তোরও চেনা হতে পারে।

—"তাই নাকি? কে? কে বলতো?"

—"আরে সেটাই-তো মনে করতে পারছি না।" শিবনাথকে বিমর্ষ দেখায়। "দেখা হলে ও নিশ্চয়ই চিনতে পারতো আমাকে। আজকাল আমি কিছু মনে রাখতে পারছি না।"

আমারও মনটা খারাপ লাগছিল। তখন তেরো বছর বয়েস আমাদের দুজনেরই। আমি সেই প্রথম বাবা-মা-দিদি-ছোড়দিকে ছেড়ে এত দূরে এসেছি শিবনাথের সঙ্গে। দুজনেরই সীনিয়র ক্রেমব্রিজ পরীক্ষা শেষ। শিবনাথদের বাড়ি ছিল আমাদের ভাঙা বিধ্বস্ত একতলা অন্ধকার ভাড়া-বাসার কাছে। ওরা বিরাট বড়লোক। বাবা ব্যারিস্টার। এক দাদা এঞ্জিনীয়র, আরেক দাদা ব্যারিস্টার আর ছোড়দা মানে নিখিলদা তো বিলেত থেকে ডাক্তারি পাস করে এসে বম্বেতে বিরাট চাকরি পেয়েছিলেন। এক একজনের একেকটা গাড়ি। চারতলা বাড়ির একতলাটা শুধু ভাড়াটে বসেছিল। আমরা চিরকালই গরীব। গরমকালে ঐ আলোহাওয়াহীন ঘরে ফ্যানও ছিল না। তবু আমাকে শিবনাথের বাড়ির সকলে খুব ভালবাসতেন। একবার নিখিলদা আর উমা-বৌদি বেড়াতে এসে মাকে বলে গিয়েছিলেন, আমাকে যেন শিবনাথের সঙ্গে বম্বে পাঠানো হয়। কেননা, আমি ভীষণ রোগা।

বম্বেতে উমা-বৌদি আর নিখিলদা আমার নিজের দাদা বৌদির অভাব মিটিয়েছিলেন। তবু বাড়ির জন্য ওটাই তো মন কেমন করার বয়েস। ভেবেছিলাম, চেনা জানা যত মানুষের সঙ্গে দেখা হয় ততই ভাল।

শিবনাথের কথায় আরো চঞ্চল লাগছিল। সে বলেছিল: "অমল, মেয়েটিকে ঠিক কি রকম

দেখতে জানিস ?"

—"কি রকম ?"

—"মানে অনেকটা অদিতির মতন। ঠিক বুঝতে পারছিনা, নাও হতে পারে।"

একজনের সঙ্গে আরেকজনের চেহারার মিল কত সময় তো চোখে পড়ে। তাই আমি বেশ জোরে বলেছিলাম: "তাই নাকি ? তা হলে অদিতি আর ওর ভাইটাইরা নয় তো ? ওরাও হয়ত বেড়াতে এসেছে আসাম থেকে।"

কথা বলেও মনে খটকা থেকে গিয়েছিল। অদিতিকে শিবনাথ আমার মতনই ভাল ভাবে চেনে। আমাদের দুজনের এত ভুল হল তাকে চিনতে ?

অদিতি আমার অনেক দূর সম্পর্কের এক মামাতো বোন। ছোড়দির বয়েসী। ছোড়দি আমার থেকে এক বছরের বড়। অদিতিকে তাই আমরা 'দিদি' বলিনি কোনোদিন। তা ছাড়া ও এত খেলাধূলো হৈ চৈ করতো যে মনে হত আমাদের থেকেও ছোট। শিলঙ থেকে এসে মাঝে মধ্যে ওদের ভবানীপুরের বাড়িতে উঠতো। ছোড়দির সঙ্গেই ওর বন্ধুত্ব ছিল খুব বেশি। তখন তেরো চোদ্দ বছরের মেয়েদেরও শাড়ি পরার নিয়ম। এখনকার ম্যাকসি আর কাপ্তান ওঠেনি তখন। কিন্তু শাড়ি পড়লেও দৌড় ঝাঁপে ওস্তাদ ছিল অদিতি। ওর সঙ্গে কোন খেলায় আমরা জিতিনি। যে কদিন থাকতো, আমি আর শিবনাথ সুযোগ পেলেই খুব খেলাধূলোয় মেতে থাকতাম। ছোড়দির আবার ও সব পোষাতো না। ছোড়দি ভালবাসতো সিনেমা-থিয়েটার দেখতে। অদিতি যখন বাবা মার সঙ্গে শিলঙ ফিরে যেত, আমাদের মন খারাপ হত খুব। অদিতি দুরন্ত মেয়ে হলেও চোখে টসটস করতো জল। তখন শিলঙ আসামের রাজধানী। রবি ঠাকুরের 'শেষের কবিতা' পড়ে ছোড়দি কি চমৎকার প্রাকৃতিক বর্ণনা দিয়েছিল যে ইচ্ছে করতো চলে যাই আমরা। অদিতির বাবা মা বলতেন—"তোমরা একবার এসো কিন্তু, খুব ভাল লাগবে।" কিন্তু সব সুযোগ কি আর আসে ? অদিতি চলে যাবার পর বছর ঘুরে যেত, আমরাও ভুলে যেতাম সব কিছু। ওরা দু'তিন বছর হয়ত আসতোই না।

সেবারেও অদিতিরা প্রায় বছর চারেক কলকাতায় আসে নি। আমরা গাড়ির ভেতর এই সবই আলোচনা করছিলাম।

জুহু সমুদ্র তীরে আরব সাগরের উত্তাল ঢেউ আমাদের জুতো জামা ভিজিয়ে কোমর পর্যন্ত চলে আসছিল মাঝে মাঝে। হঠাৎ দেখি শিবনাথ সমুদ্রের দিকেই চলে যাচ্ছে একা ওকে হিড়হিড় করে টেনে এনে বললাম: "এই, কোথায় যাচ্ছিলি ? তোর ভয় নেই ?

কি রকম যেন স্বপ্নভাঙা অবস্থার মত শিবনাথ বলল: "এই শোন, আমি দেখছিলাম, ঐ মেয়েটা আর ছেলেগুলো জলের দিকে যাচ্ছে, আমিও তাই যাচ্ছিলাম।"

আমি কিছুই দেখি নি। তবু ভাবলাম, অনেকেই তো প্রাতঃভ্রমণে এসেছেন। এঁদের মধ্যে ঐ সবুজ অস্থিনের ছেলেমেয়েরাও হয়ত গিয়ে

থাকবে। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। হয়ত আমার নজরে পড়েনি। এই ভেবে আমি শিবনাথের সঙ্গে এ-বিষয়ে আর আলোচনা করিনি।

কিন্তু বাড়িতে ফিরে আমি এই ব্যাপারটা কেন যে উমা-বৌদিকে বলেছিলাম জানি না। হয়ত ওঁর চমৎকার ব্যবহারে কোন কথা উমা-বৌদিকে লুকোতে ইচ্ছে করতো না। উনি এমন বন্ধুর মতন আমাদের সঙ্গে মিশতে পারতেন যে ওঁকে শ্রদ্ধা যেমন করতাম, ভালও বাসতাম তেমন। যা হোক, এই কথাটা যখন বলি, তখন শিবনাথ সামনে ছিল না।

তা' হল কি, এর দিন তিনেক পরে একদিন রাত্রের শোয়ে টারজানের সিনেমা দেখতে গিয়ে হঠাৎ নিখিলদা গাড়িতে শিবনাথকে বলেছিলেন "এই শিবু তোর আজকাল কি হয়েছে বলতো? সব সময় চুপচাপ কি ভাবিস?"

—"কিছুতো না ছোড়দা" শিবনাথ অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল।

উমা-বৌদি বললেন: "আহা! বাইরে বেরিয়েও তোমার ডাক্তারি! ও সব নিয়ে ভেবো না। ও ঠিক হয়ে যাবে।"

যাতে কোনো কিছুতে আমাদের মন খারাপ না হয় সে জন্য উমা-বৌদি সব সময় আমাদের স্বপক্ষেই থাকতেন।

মনে আছে নিখিলদাকে যেন সামান্য উদ্বিগ্ন দেখিয়েছিল—"উমা, তুমি বোঝ না, বিশেষ ক'রে এই বয়সে এরকম হওয়াটা ঠিক না। ডাক্তারিতে আমরা একে 'মেলানকলিয়া' বলি··· ওর এরকম হবে কেন? কৈ, অমল তো দিব্যি হাসিখুশি।···"

এরপর থেকে কাউকে বুঝতে না দিয়ে নিখিলদা যেন লক্ষ্য রাখতেন শিবনাথের ওপর। সে যাক্। সেদিনের সিনেমার কথায় ফিরে আসি।

প্যারামাউন্ট সিনেমা-হল এ আমরা রুদ্ধশ্বাসে টারজানের ছবি দেখছিলাম। এখন যেমন তোমরা কুংফু, কারাটে মার্কা ছবি বা ফ্যানটমের কীর্তি কলাপ দেখতে বা পড়তে খুব উদ্‌গ্রীব, সে সময় টারজান্ এর রোমহর্ষক চলচ্চিত্র আমাদের খুব প্রিয় ছিল।

ঐ দিন রাত্রে আমি আর শিবনাথ পাশাপাশি দুই চেয়ারে, আমাদের বাম দিকে নিখিলদা আর বৌদি। ড্রেস্ সার্কেলে ব'সে টারজানের কুমিরের পিঠে চড়ে নদী পার হওয়ার দৃশ্য দেখতে দেখতে আমার যেন দম আটকে যাচ্ছিল।

ঠিক সে সময় শিবনাথের কানে কানে কথাতে আমি চমকে গিয়েছিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য, শিবনাথ যা দেখাল, আমার তাতে রীতিমত ভয় ভয় করছিল।

আমি স্পষ্ট দেখলাম সামনের ব্যাল্‌কনিতে যাঁরা বসে আছেন, তাদের মধ্যে একজনের শাড়ির আঁচল মাঝে মাঝে উড়ছে। হল্ তো অন্ধকার, কিন্তু সিনেমার পর্দা থেকে যেটুকু আলো ঠিকরে আসে, তাতে এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। আমি যেন নিথর হয়ে গিয়েছি। এমন সময় সিনেমার বিরতি হল, আলো জ্বলল, উমা বৌদি ডেকে বললেন; "অমল, শিবু, তোমাদের খিদে পায়নি? তোমাদের ছোড়দার যেমন কাণ্ড, হাসপাতাল থেকে ফিরেই

সিনেমা, কিছু খাওয়াতে পারিনি, নিশ্চয়ই তোমাদের খিদে পেয়েছে।

আমি ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে ছিলাম। শিবনাথও চুপচাপ। নিখিলদা বাইরে থেকে খাবার এনে দিলেন।

ছবি ভাঙলো রাত পৌনে বারোটায়। ফোর্ড গাড়িতে সবে উঠেছি, শিবনাথ আমার হাতে চাপ দিল। ওহ! কি যে ভয় পেয়েছিলাম! রাস্তায় অনেক লোকের সঙ্গে ধীরে ধীরে একজনের উড়ন্ত এবং চলন্ত আঁচল যেন দূরে ক্রমশঃ মিলিয়ে যাচ্ছে! ঝাপসা রাত্রে আর কিইবা দেখব।

এরপর শুধু বম্বেতেই না কলকাতায় ফিরেও কতদিন যে ঐ উড়ন্ত আঁচল এবং চলমান একজন মেয়েকে কল্পনার চোখে ভাসতে দেখিছি তার ঠিক নেই। শিবনাথের কি রকম হয়েছিল জানি না। তবে পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুনো, আমার বাবার মৃত্যু দিদি ছোড়দির বিয়ে, আর্থিক অভাব-অনটনে ও-সব আর মাথায় আসেনি। রাত্রের কলেজে ভর্তি হয়ে দিনের বেলা আমাকে একজন বড় দোকানের মালিকের কাছে চাকরি করতে হচ্ছিল। স্কলারশিপের টাকায় আমি আর মা—এই দুজনের সংসার টানা কঠিন হয়ে উঠেছিল। ভেবেছিলাম আমার জীবন থেকে সেই চলমান অশরীরীর মতন উড়ে যাওয়া আঁচলের কোনো মেয়ে আর আসবেই না।

## দুই

দিল্লীতে শিবনাথের সঙ্গে বেড়াতে যাবার সুযোগ কি ক'রে হয়েছিল, সে বর্ণনা অন্য কোনো সময়ে লেখা যাবে।

তখন আমি বি. এ. পড়ছি, শিবনাথ বি. এস-সি। ছোড়দি জামাইবাবু পুজোর সময় এলাহাবাদ থেকে এসে আমার মায়ের কাছে থাকার দরুণ আমিও নিশ্চিন্তে দিল্লী যেতে পেরেছিলাম। এবারে উঠেছিলাম শিবনাথের মাসিমার কারোলবাগের বাড়িতে। ওখানে ক্লাস টেন-এ পড়া অরিন্দম তার ক্লাস এইটের মুমু শিবনাথের মাসতুতো ভাইবোন আমাদের পেয়ে ওরা আনান্দে আটখানা।

একদিন দুপুরে আমরা কুতুব-মিনার দেখতে বেরিয়ে গেলাম

মুমু লেখাপড়ায় যাকে বলে ব্রিলিয়ান্ট। ক্লাস এইটে পড়লেও ওর স্কুলের সিলেবাসের বাইরে যে এত পড়াশুনা আমি ভাবতেই পারিনি। ওর সব কিছু জানার কৌতূহলও ছিল প্রচণ্ড। ওর নানা রকম প্রশ্নে মাঝে মাঝে আমাকেও চিন্তা করতে হচ্ছিল।

তা, সত্যি বলতে হিন্দু-মুসলমানের যৌথ স্থাপত্যও ভাস্কর্যের অতুলনীয় কীর্তি কুতুব-মিনার যা পাথরের তৈরী জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মিনার বলে পরিচিত তার সামনে দাঁড়িয়ে আমার যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে সত্যি এসেছি এখানে।

এই মিনার গড়তে বহু বছর ধরে কত শ্রমিক এবং শিল্পীর পরিশ্রম পড়েছে তার কথা ইতিহাস লেখেনি। আমরা শুধু রাজারাজড়াদের সম্পর্কেই পড়েছি।

রায়াশখারো দুর্গ জয় করেন কুতুব-উদ্দীন

খ্রীষ্টাব্দে। সেই এলাকাই এখন কুতুব মিনার নামে পরিচিত। চৌহান রাজপুত পৃথ্বীরাজ আবার রায়পিথোরা নামেও পরিচিত। অনেক ঐতিহাসিক এর মতে তখনকার সাতশটা হিন্দু আর জৈন মন্দির ভেঙে তার পাথর দিয়ে এটা ধীরে ধীরে তৈরী হয়েছিল। কুৎব-উদ্দীন একটা পাথরে উৎকর্ণ লিপিতে তা স্বীকার করে গেছেন।

আমি আর মুমু পুবদিকের তোরণে সেই পাথর খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। মুমু জিজ্ঞেস করেছিল, শুধু কুৎব-উদ্দীন আইবক্, সামসুদ্দীন ইলতুতমিস্, আলাউদ্দীন খিলজী আর ফিরোজ শাহ তুঘলুক কি এটা তৈরী করেছিলেন?

কত জনশ্রুতিই তো শোনা যায়। ইলতুতমিস এটা শেষ করেন, তা সবাই পড়েছে ইতিহাসে। মুমুর প্রশ্ন আর থামে না। দুশ আটত্রিশ ফিট উঁচু, আর তিনশ উনআশিটা সিঁড়ি মেপে দেখা যাবে না। দূর থেকে দুজন শুধু বিস্ময়ে মাঝে মাঝে থমকে যাচ্ছিলাম।

এই মিনারের শীর্ষে যে কি ছিল তা আজও রহস্য। বজ্রপাতে নষ্ট হয়েছে অনেক কিছু। মেজর সিনথ নামে একজন ইংরেজ আড়াইশ বছর আগে পাথরের ছাতা তৈরি করিয়েছিলেন এর মাথায়। লর্ড কার্জন সেটা নামিয়ে দেন। সেটাও আমরা দেখলাম টিকিট-ঘরের সামনে।

জৈনিক চন্দ্ররাজার বিষ্ণু মন্দিরের গরুড় ধ্বজা হিসেবে এটা তৈরী হয়, এও পড়েছি। কেউ বলেছেন বিক্রমাদিত্যের আমলে, কেউ লিখেছেন কুমার গুপ্তের সময় এর প্রস্তুতি শুরু হয়। তবে কুৎব-উদ্দীনের সময় হয়তো কোনো হিন্দুরাজা একটা বড় লোহার স্তম্ভ বিষ্ণু মন্দিরে স্থাপন করেছিলেন। কুৎব-উদ্দীন সেটা নিজের মসজিদে স্থাপন করেন। কি আশ্চর্য! দেড়হাজার বছরেও সেই লোহার গায়ে একটুও তো মরচে পড়েনি।

মুমুর প্রশ্ন, কুৎব-উদ্দীন যদি এটা তৈরী ক'রে থাকেন, তাহলে অনেকে কেন বলেন চোহানের রাজপুত পৃথ্বীরাজ তাঁর বিধবা মেয়ের জন্য এটা বানিয়ে ছিলেন? যাতে এই দুর্গের ভেতরে থেকে ওঁর মেয়ে যমুনা দেখতে পান, এটা কি সত্যি?

বোধ হয় না। শুধু হিন্দুরাজার তৈরী হলে হিন্দু এবং মুসলিম দুই ধর্মের শিল্পকলা এতে দেখা যেত না। তাই বললাম মুমুকে। ঘুরে ঘুরে ইলতুতমিসের সমাধি, আলাউদ্দীনের সমাধি দেখতে যেন কেমন গা ছমছম ক'রে।

নানান আলোচনায় আমরা পশ্চিমের আলাই দরজা থেকে কখন যে উত্তরের আলাইমিনারে চলে গিয়েছি খেয়ালই নেই। আলাইমিনার এখনও অসমাপ্ত। এত বছর ধরে কোনো রাজা কেন যে এটা শেষ করেন নি কে জানে!

আমরা কুৎব-মিনারের ভেতর ঢুকে পড়েছি তখন। বাইরের ঘুলঘুলি দিয়ে যেটুকু আলো আসে তাতে অন্ধকার কাটে না। আমি আর মুমু একটা দুটো করে তিনশ উনআশিটা সোপানের শুরুতে পা রেখেছি সবে। ঘোরানো সিঁড়ি, যাঁরা উঠানামা করছেন, তাঁদের গায়ে গা লেগে যায়। ওপরে চোখ যেতে হঠাৎ আমি চমকে উঠলাম।

আমার সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়েছে। আমি

দেখলাম আমাদের কয়েকটা সিঁড়ি ওপরে একটা মেয়ে উঠছে একা। ওখানে বাতাস তো নেই। তবু তার আঁচল উড়ছে। মুমু কি দেখেছে জানি না। সে বলল, অমলদা বাইরে চলো। ভয় করছে। এখানে সেই পৃথ্বীরাজের মেয়ে বোধ হয় এখনও আছে।

ঠিক সে সময় একটা চীৎকারে অনেকেই বাইরে বেরিয়ে এলাম। সত্যি এতক্ষণ অরিন্দম আর শিবনাথের কথা মনে পড়েনি। কি ভাবে যে দৌড়তে দৌড়তে ইলতুতমিসের সমাধির কাছে গিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই আজ।

দেখলাম শিবনাথ ইলতুতমিসের সমাধির সামনে শুয়ে আছে। অরিন্দমের কাঁদো কাঁদো মুখ। অনেকেই সাহায্যে এগিয়ে এলেন। শিবনাথের জ্ঞান ছিল, তবে সে কথা বলতে পারছিল না যেন।

হঠাৎ কোথা থেকে ট্যাক্সি ছুটে এল কে জানে। কারোলবাগে ফেরার পথে শিবনাথ আর অরিন্দম একজনের পিছনে ছুটতে শুরু করে। শিবনাথ নাকি স্পষ্ট দেখেছে একটি মেয়েকে, তাঁর আঁচল উড়ছিল। সে 'শুনুন' 'শুনুন' ব'লে দৌড়তেই কে যেন তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল।

*

কলকাতায় ফেরার পরেও ছোড়দি-জামাইবাবু ছিলেন। কোনো এক ছুটির দিনে আমি, শিবনাথ, ছোড়দি বাইরে মাঠে পায়চারি করছিলাম।

শিবনাথ বলল : আচ্ছা ছোড়দি, অদিতি আজকাল আর আসে না, না ?

হঠাৎ থমকে গেল ছোড়দি। বলল : "তোরা কিছু খবর রাখিস না ? অদিতি যে পাঁচবছর আগে শিলঙে মারা গেছে জানিস না ?"

—•—

# মনেরেখো

১। পৃথিবীর প্রাচীনতম সংসদীয় গণতন্ত্রপ্রথা কোথায় আছে ?

উত্তর—গ্রেট ব্রিটেন।

২। ইতিহাসের সব থেকে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ কোন দেশে কখন হয়েছিল ?

উত্তর—চীন দেশে, ১৮৭৭ থেকে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ৯৫,০০,০০ লোক মারা যায়।

৩। পার্সীদের ধর্মগ্রন্থের নাম কি ?

উত্তর—জেন্দাহ্-আবেস্তা।

৪। বলত, পারী সহরের কাছে সম্রাট চতুর্দশ লুই পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম সুন্দর যে রাজপ্রাসাদটি তৈরী করেছিলেন সেটির নাম কি ?

উত্তর—ভার্সাইল রাজপ্রাসাদ।

৫। এমন একজন আইরীশ মহিলার নাম কর যিনি ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন ?

উত্তর—ডাঃ অ্যানি বেসান্ত।

৬। ভারতের প্রথম ভাইসরয়ের নাম কি ?

উত্তর—লর্ড জর্জ ক্যানিং।

সোনিশ্রী পাল

# এই-টুকুন

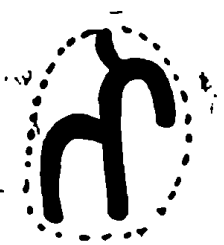

বিমলভূষণ

অনেক খোঁজাখুঁজির পর টুকুনকে পাওয়া গেল।

তার ন'দাদুর ঘরের বড় পুরোনো আলমারিটার সঙ্গে দেওয়ালের যে সামান্য ফাঁকটুকু ছিল, তারি মাঝখানে গুটিশুটি মেরে ব'সে ছিল।

কখন যে সে ওখানে ঢুকেছিল তা তার মনে নেই। আর কারোর পক্ষেও তা জানা সম্ভব ছিল না। কারণ সবাই যে-যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

ন'দাদুর অবশ্য টুকুনের চলা-ফেরা, শোওয়া-বসা, খাওয়া-দাওয়া সব খবরই মুখস্থ ছিল।

সেই ন'দাদুই সেদিন খাটে শুয়ে শুয়েই কোথায় যেন চ'লে গেল।

সব্বাইকে কত জিজ্ঞেস ক'রল টুকুন "কোথায় যাচ্ছে ন'দাদু?"

সবাই-ই তাকে এড়িয়ে গেল। অনেকেই কেন কাঁদছিল তাও সে বুঝতে পারে না। শুধু মা ব'ললে, "উনি ভগবানের কাছে গেলেন।"

কথাটা কিন্তু টুকুনের বিশ্বাস হয় নি।

সে শুনেছে ভগবানের কাছে যারা যায় তারা অনেকদিন শুয়ে থাকে, ছট্‌ফট্ করে। আরো কত কী যেন হয় তাদের।

কত্তা-মা তো কদ্দিন ধ'রে ঐরকমভাবে থেকে এই সেদিন ভগবানের কাছে গেল।

কিন্তু ন'দাদু কি ক'রে এত তাড়াতাড়ি ভগবানের কাছে যেতে পারে?

তাই তো সে বারবার সবাইকে জিগেস ক'রেছে। কিন্তু কেউই তাকে পাত্তা দেয়নি।

অনেক ভেবে সে ঠিক করল, ঐ আলমারি আর দেওয়ালের ফাঁকে চুপটি ক'রে লুকিয়ে ব'সে থাকবে। তা হ'লে ন'দাদুই এসে তাকে খুঁজে বার ক'রে আবার কোলে নেবে, চুমু খাবে, খেলনা দেবে। এর আগে বরাবর তো তাই ক'রেছে ন'দাদু।

কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ ব'সে থাকার পরও ন'দাদু এল না দেখে তার চোখে জল এসে গেল। জোর ক'রে তা চেপে ঠোঁট ফুলিয়ে সে বসে রইল, ন'দাদুর আসার আশায়।

এরই ভেতর সে শুনতে পেয়েছে বাড়ী-সুদ্ধু সবাই তার নাম ধরে ডাকাডাকি ক'রছে। কিন্তু, টুকুন ঠিক ক'রেছিল, ন'দাদু ছাড়া কারুর ডাকে সে সাড়া দেবে না।

* * * *

হঠাৎ টুকুন দেখে, ন'দাদু এসে সামনে দাঁড়িয়ে হাস্‌ছে।

তার মনে খুব আনন্দ হ'লে কি হবে, অভিমানও কম ছিল না।

তাই মুখ ফিরিয়েই ব'সে রইল।

তবে, কে যেন জোর করে তার মুখটা ন'দাদুর দিকে ফিরিয়ে ছাড়ল। দেখল, ন'দাদু তেমনি হাসিমুখেই তার দিকে চেয়ে আছে।

টুকুনের সত্যি বড় কষ্ট হচ্ছিল।

এমন হ'লে-বরাবর ন'দাদু এসে আগে তাকে বাইরে এনে কোলে তুলে নিত। আজ সে শুধু

হাসছে দেখে, টুকুন তার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা দাড়িতে লাগিয়ে টেনে নিয়ে জানিয়ে দিল ন'দাদুর সঙ্গে তার আড়ি।

আড়ি জানিয়েও সে আড়চোখে দেখল, ন'দাদু তার দিকে দু হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাতে টুকুনের অভিমান আরো বেড়ে গেল। তাই সে মুখ ফিরিয়েই ব'সে রইল।

হঠাৎ তার কানে এল ন'দাদুর খুব আস্তে ভাঙা গলায় তাকে ডাকছে, "এ-ই টু-কু-ন্।"

আহা, ন'দাদুর গলায় কি যেন হয়েছিল। সবাই কি যেন ব'লত নামটা? হ্যাঁ, হ্যাঁ ক্যান্সার। তাই বলে গলাটা এমন ভেঙে গেছে?

আর টুকুনের পক্ষে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকা হ'ল না। ন'দাদুর দিকে ফিরে সে বলল, "আমায় তুমি কোলে নিলে না; আর আমি কোনোদিন তোমার কাছে যাব না।"

এতক্ষণে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

আর, ঠিক সেই সময় ঘরটা আলোয় ভ'রে উঠল। আর ন'দাদু কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। তাতে তার কান্নাটা বুক ঠেলে বেরিয়ে এল।

কিন্তু, তখনই সে দেখল, বড়দি তার সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার ক'রে ব'লছে, "ওমা, শীগগির এসো। দেখো, টুকুন এইখানে ব'সে রয়েছে।"

সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীসুদ্ধু সবার গলা শোনা গেল "কই, কই?"

তারপর বাবা, দাদা, জ্যাঠা, কাকা সবাই মিলে আলমারিটা ঠেলে সরিয়ে তাকে বার ক'রে এনে তাদের ঘরে নিয়ে গেল।

সে কিন্তু কিছুতেই কাউকে বোঝাতে পারল না, কেন সে সেখানে গিয়ে বসেছিল। আর কেনই বা তারা অমন হৈ চৈ ক'রে তার ন'দাদুর কাছে যেতে দিল না, এটুকু সে কিছুতেই বুঝতে পারল না।

শুধু একটা কথা সে বুঝতে পারল যে, ন'দাদুর কোলে ওঠা তো দূরের কথা, তার ঘরের দিকে যাওয়াই তার বরাবরের জন্যে বন্ধ হ'য়ে গেল।

---

# বিমান ভ্রমণ

নিরঞ্জন হালদ

আমাদের ছেলেবেলায় অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিমানে যাতায়াতের চল ছিল না। আমার পরিচিত কেউ তখনো পর্যন্ত বিমানে চড়েন নি। মাঝে মাঝে আকাশে কোনো বিমান একদিক থেকে অন্য দিকে প্রচণ্ড গর্জন করতে করতে চলে যেত, আর আমরা ঘর বা স্কুল থেকে বাইরে এসে আকাশে বিমানের গতিপথের দিকে চেয়ে থাকতাম। তখন শুনতাম, বাঙালীরা বিমানে চড়তে পারে না। বিমানে চড়লে নাকি বাঙালীদের মাথা ঘুরে যায়। আমি মনে মনে ভাবতাম, ইংরেজরা বাঙালীদের বিমানে চড়তে দিতে চায় না বলে বাঙালীদের সম্পর্কে ওই বদনাম রটিয়ে দিয়েছে। মাটিতে বিমান নামতে দেখলাম এবং খুব কাছ থেকে বিমান দেখার সুযোগ পেলাম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। তখন খুলনা শহরের মাঝখানে খেলার মাঠগুলিকে বিমান অবতরণের ক্ষেত্রে পরিণত করা হয়েছিল। সেখানে মাঝে মাঝে বিমান বাহিনীর প্লেন নামত আর আমরা গোটা শহরের লোক গিয়ে ভিড় করতাম সেই মাঠে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কলকাতা থেকে ঢাকা ও চট্টগ্রামে যাত্রীবাহী বিমান চলাচল শুরু হয়। আর একটা বিমান বন্দরের সঙ্গে অন্য বিমান বন্দরের দূরত্ব কম বলে ভাড়াও কম ছিল। তবে বিমানে চড়তে চাইলে কত কম খরচে চড়া যায়, সে সব খোঁজ নেওয়ার কথাও মনে হয়নি। তখন অর্থাভাবে পড়াশুনা চালানোই কঠিন ছিল। তাই বিমানে চড়ার স্বপ্নও কখনও দেখিনি। আমার পরিচিতদের মধ্যে প্রথম বিমানে চড়েন দৌলতপুর কলেজে আমাদের দু-ক্লাস উপরে পড়া হালিম ভাই। হালিম ভাই গ্রামের জমি বিক্রি করে খুলনা থেকে কলকাতা এসেছিলেন, বিমানে করে ঢাকা যাওয়ার জন্য। আসলে বিমানে চড়াই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। হালিম ভাই ঢাকা হয়ে খুলনা ফিরলে আমি ও আমার আর এক বন্ধু মান্নান হালিম ভাইকে পাকড়াও করি। তাঁর বিমানে চড়ার অভিজ্ঞতা জানার জন্য আমরা খুবই উদ্‌গ্রীব ছিলাম। হালিম ভাই আমাদের শুনিয়েছিলেন : বিমান প্রথমে আকাশে ওঠার সময় প্রচণ্ড ধাক্কা দেয় আর এই ধাক্কা সামলাবার জন্য বিমান চলা আরম্ভ করার আগেই আসনের সঙ্গে লাগানো বেল্ট দিয়ে কোমরটা বেঁধে রাখতে হয়। বিমানটি আকাশে চলতে আরম্ভ করলে বেল্ট খুলে ঘরে হাঁটার মতো প্লেনেও হেঁটে চলাফেরা করা যায়। প্লেন থেকে নিচের ঘর-বাড়ি বিন্দু মনে হয়! আর মনে হয়, প্লেন খুবই আস্তে আস্তে চলছে, এত আস্তে চলছে বলে অনেক সময় একঘেঁয়েমি লাগে। তবে

কলকাতা থেকে ঢাকা যেতে মাত্র আধঘণ্টা লাগে বলে হঠাৎ একঘেঁয়েমির বদলে ঢাকা বিমান-বন্দরে নামার বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়।

খুলনার হালিম ভাইয়ের প্লেনে চড়ার গল্প শোনার প্রায় বারো বছর বাদে প্রথম বিমানে চড়ার সুযোগ হয়। ১৯৬০ সালের অকটোবরে দমদম থেকে যাই ইনটারন্যাশানালের বিমানে ব্যাংকক যাই। বিদেশে যাওয়ার এই সুযোগ করে দেন ভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী নামে এক কম-বয়সী শুভানুধ্যায়ী। থাইল্যাণ্ডের একটা সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ভারতের কথা ভালভাবে বলাবার জন্য তিনি আমাকে পাঠাতে সচেষ্ট ছিলেন এবং তিনিই কলকাতার বিভিন্ন ট্রাভেল এজেন্সিতে গিয়ে অনেক বেশী কমিশনে এবং বাকীতে আমার জন্য একটা থাই ইনটারন্যাশানালের টিকিট যোগাড় করেছিলেন।

থাইল্যাণ্ডে যাওয়ার আগে ওই দেশ সম্পর্কে বিদেশীদের লেখা কয়েক বই পড়ি এবং ব্যাংকক সম্পর্কে কিছু ধারনার জন্য কলকাতার সেণ্ট জেভিয়ারস কলেজের ব্যাংকক থেকে আসা এক শিখ ছাত্রের সঙ্গে দেখা করি সেই শিখ ছাত্র আমাকে রীতিমতো ভয় ধরিয়ে দেয়। থাই না জানলে নাকি ব্যাংককে আদৌ চলাফেরা করা যাবে না। কারণ ওখানে কেউ ইংরেজী বোঝে না। ওদিকে আবার অনেক কষ্টে টিকিট সংগ্রহ হয়েছে, পাশপোর্ট-ভিশা হয়েছে, অনেকে জেনেও গিয়েছে যে আমি থাইল্যানড যাচ্ছি। তাই না গিয়ে উপায়ও ছিল না।

যাই হোক, বিমানে প্রথম চড়ার অভিজ্ঞতাও অদ্ভুত। দমদম বিমান বন্দরে থাই ইনটারন্যাশানালে টিকিট জমা দেওয়ার পর প্লেনের সীট নম্বর ছুটো এমবারকেশান ও ডিম এমারকেশান কার্ড পেলাম। থাই বিমান যাত্রীদের ভিতরে গিয়ে রেডি হওয়ার কথা বললে প্রথমে টাকা বদলে 'থাই বাট' নিলাম। তারপর বিমানে ওঠার গলিতে প্রবেশ করে পুলিশকে পাশপোর্ট, স্বাস্থ্য-বিভাগকে হেলথ সারটিফিকেট দেখানোর পর শুল্ক-বিভাগকে স্যুটকেস খুলে জিনিসপত্তর ও মানিব্যাগের টাকা পয়সা দেখাতে হল। তখন বিদেশে যাওয়ার সময় সঙ্গে ৭৫ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা নেওয়া যেত। আমার কাছে মাত্র ৪০ টাকার থাই নোট দেখে শুল্ক-বিভাগের লোকেরা সন্দেহ করেছিল, আমার পকেটে সম্ভবত ডলার নোট আছে। কারণ তাঁদের ধারণা, এত কম টাকা নিয়ে কেউ বিদেশে যায় না। থাইল্যানড পৌছালে যখন সেমিনার কর্তৃপক্ষ সব ভার নেবেন।

বিমান ছাড়তে দেরী থাকায় বিমান কোম্পানি আমাদের টারমিনাল বিলডিং থেকে ট্রানজিট লাউঞ্জে নিয়ে গেল। আমরা সেখানে কেউ কফি, কেউ কোকাকোলা খেলাম। এক টেবিলে বসে-ছিলাম বলে আলাপ হল এক ডাচ ইনজিনীয়ারের, যিনি সুন্দরবন দেখে ব্যাংককে একাজের সদর দপ্তরে ফিরে যাচ্ছিলেন।

ট্রানজিট লাউনজ থেকে একটা ভ্যানে করে আমাদের বিমানে সিঁড়ির নিচে নামিয়ে দেওয়া হল। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে প্লেনের মধ্যে ঢুকতে

যাব, এমন সময় গোলাপী রঙের স্কার্ট পরা এক থাই এয়ার হোসটেস হাতে একটা গোলাপফুল দিয়ে "গুড মর্নিং, উইশ ইউ এ নাইস জারনি" বলে ভিতরে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দিলেন। জানালার পাশেই সীট পড়েছিল। কিছুক্ষণ পরেই মাইকে আমাদের বেল্ট আঁটতে বলা হল। তারপর প্লেনটা রানওয়ে দিয়ে ছুটতে আরম্ভ করল এবং একসময় হঠাৎ রানওয়েতে ধাক্কা দিয়ে উপরে উঠতে থাকল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি আমাদের প্লেনকে মেঘের উপরে উঠতে দেখলাম। প্লেনে সোজাভাবে চলতে শুরু করার আগে এক এয়ার হোসটেস সামনে অনেকগুলি কাগজ ও পত্রপত্রিকা তুলে ধরলেন। বিদেশী বিমানে বাংলা পত্রিকা দেখে অবাক হলাম। আমি বাংলা কাগজটাই তুলে নিলাম। এরপরেই স্টুয়ার্ট এসে সামনের সীটের সঙ্গে লাগানো ছোট্ট টেবিলের ডালনা খুলে দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে এমন একটা পাকানো গরম তোয়ালে রেখে গেলেন। সেই তোয়ালে দিয়ে হাত মুখ মোছার পরেই এক থাই হোসটেস এক চকলেট-ভরতি একটা প্লেট এনে সামনে ধরলেন। আমি দুটে চকলেট তুলে ধরলাম তারপরেই এল প্লেট-ভরতি ব্রেকফাস্ট। সেটা খেয়ে শেষ করছি এমন সময় চা এবং কফি এল। যে যা খাবে, তাকে সেই জিনিস দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে একবার খোঁজ নিয়ে গেল আমি ভেজিটেবিয়ান কিনা।

খাওয়ার পর্ব শেষ হতেই জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে থাকলাম। অনেকক্ষণ ধরেই আমাদের প্লেন বঙ্গোপসাগর দিয়ে চলেছে। অনেক নীচে নীল সমুদ্র। ইতিমধ্যে আমার মনের মধ্যে ভয় ধরেছে। বিমান দুর্ঘটনা তো মাঝে মাছে ঘটেই থাকে। এই বিমানে যদি কোনো রকম দুর্ঘটনা ঘটে, তা হলে বিমানে তো পুড়েই মারা যাব। জানালার উপরে ইংরেজীতে লেখা আছে, দুর্ঘটনা ঘটলে এখান থেকে গলিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে। কিন্তু কী ভাবে ওগুলি খুলতে হবে, তার কোনো নির্দেশ নেই। আগে ওগুলি দেখে না রাখলে দুর্ঘটনার সময় বের হব কী করে? মনে হল, বিমান দুর্ঘটনায় সব যাত্রীই যে মারা যায়, তার কারণ সম্ভবত একটাই। কোনো যাত্রীই জানে না, বিপদের সময় কী ভাবে জানালা খুলে বাইরে লাফ দিতে হয়। রেস্টুরেন্টে যেমন প্রত্যেক টেবিলে ছাপানো মেনু থাকে, তেমনি বিমানে প্রতিটি সীটের সামনে নিরাপত্তা-মূলক ব্যবস্থা হিসাবে কিছু ছাপানো নির্দেশ থাকলে ভালই হত। এসব কথা যত ভাবছি, দুর্ঘটনার কথা ভেবে তত বেশী শঙ্কিত হচ্ছি।

দুর্ঘটনার সময় জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়লেই যে বাঁচা যাবে, তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। কারণ নীচে সমুদ্রে পড়লে তো রক্ষে নেই, হাঙ্গর কিংবা সাপের পেটেই চলে যেতে হবে। হাঙ্গর বা সাপের উপদ্রব না ঘটলেও সমুদ্রে কতক্ষণ আর ভেসে থাকা যাবে। ডাঙ্গায় পড়লেও যে বাঁচা যাবে, তা ভেবেও আশ্বস্ত হতে পারছি না। কারণ বিমান থেকে লাফ দিলে ভারী বলে মাথা নীচের দিকে চলে আসবে আর তখন মাটিতে পড়লে মাথা তো আগেই ভাঙবে। সঙ্গে চাদর থাকলে চাদর নিয়ে লাফ দিলে চাদরে হাওয়া লেগে

হয়তো মাথা উপরের দিকে রাখা যেত এবং সেক্ষেত্রে হয়তো বেঁচে যেতাম।

এই সব হিজিবিজি চিন্তার মাঝখানেই মাইকে শুনতে পেলাম, প্লেন এখন ইরাবতীর অববাহিকার উপর দিয়ে চলেছে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্লেনটি রেঙ্গুনে নামবে। আমাদের বেল্টও বাঁধতে বলা হল। জানলা দিয়ে নীচে সবুজ মাঠ চোখে পড়ল। জমির সীমানা সোজা সরল রেখার মতো। অত উঁচু থেকে বোঝা যায় না নীচের বাড়িগুলি কেমন? বাড়িগুলি বিন্দুর মতো মনে হচ্ছে। প্লেন যত নীচে নামে, ততই মনে হয় প্লেন খুব দ্রুত গতিতে চলছে। অথচ রেঙ্গুনে নামবার জন্য প্লেনের গতিকে তখন অসম্ভব রকম কমাতে হয়েছে। মারাত্মক শব্দ করে প্লেন রেঙ্গুন বিমান-বন্দরে থামলে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে আমিও নেমে ট্রানজিট লাউনজে গেলাম। রেঙ্গুনের বিমান-বন্দরটি খুবই ছোট। টারমিনাল বিলডিং দেখে খুবই খারাপ লাগল। মনে হচ্ছিল রেঙ্গুন কোনো দেশের রাজধানী শহরের বিমান-বন্দর নয়, যেন কোনো জেলা-শহরের বিমান-বন্দরে যাদের দেখলাম, তাদের সকলেরই পরনে লুঙ্গি—মেয়ে-পুরুষ কোনো বাছ বিচার নেই। লোক-জনের চেহারা ও পোষাক পরিচ্ছদ দেখেই আমি বুঝতে পারলাম আমি ভিন্ন দেশের কোনো বিমান বন্দরে নেমেছি।

দশ মিনিট বাদেই আমাদের ফিরে যেতে হল। এখান থেকে বিমান ছাড়লে তা যাবে ব্যাংককে।

——


দারুণ আলোড়ন তুলে আগস্টেই প্রকাশিত হচ্ছে

**রহস্য বিচিত্রা**

রহস্যের নানা স্বাদ নানা বর্ণ বিচিত্র ভয়াল রহস্যে ঘেরা কাহিনীর সম্ভার।

সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিক। সেরা রহস্য লিখিয়েদের সম্মেলন :

*রহস্য বিচিত্রা ১০৲*

*সম্পাদনা । মহীন্দ্রনাথ বসু*

*প্রচ্ছদ । মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত*

সোহিনী প্রকাশনী ২৬ স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলকাতা ৭০০০০১

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

# বলটু-দার গোয়েন্দা গিরি

॥ তিন ॥

গুটি গুটি পায়ে গোবর্ধন এগোতে লাগলো। ধীরে ধীরে না হাঁটলে পায়ের শব্দ হতে পারে। তাই এগোতে হবে কিন্তু খুবই সাবধানে।

এদিকে বলটুদা দেখলো দূরে অন্ধকার ঘরের এক কোণে কারা যেন খুব ব্যতিব্যস্ত হয়ে উল্‌টে পড়ে কি যেন দেখছে। নিশ্চয়ই ওটা ম্যাপ ট্যাপ হবে। কারণ এত বড় পুরোনো বাড়ীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে গল্পের বীজ লুকিয়ে আছে। তার ওপর লোকে বলে এটা একটা কিম্বদন্তীর বাড়ী। নিশ্চয়ই কুট্টিপিসির টাকার হদিস করা একটা নকসা-টকসা আছে বৈ কি। নইলে ওই লোক-গুলোই বা খুঁজছে কী? আর খামখা-খামখা বলা নেই কওয়া নেই কুট্টিপিসিই বা খুন হবেন কেন? বিনা মতলবে তো কেউ কাউকে খুন করে না। নিশ্চয়ই খুন করবার একটা যুক্তি সঙ্গত কারণ থাকে।

বলটুদা এগোতে এগোতে দেখলে কতকগুলো ছায়ামূর্তি যেন অন্ধকারে চলাফেরা করছে। ওরাও নিশ্চয়ই গুপ্তধনের ধান্দায় এসেছে এখানে। ভেবে বলটুদা একটু আড়ালে লুকোলো। এবং সেখান থেকে লক্ষ্য করতে লাগলো কতগুলো ছায়ামূর্তি সেই নকসা নিয়ে ব্যস্ত লোকগুলোকে লক্ষ্য করে এগোল। নিশ্চয়ই ওরাও ওই গুপ্ত ধনের খবর পেয়েই চলেছে তা উদ্ধারের জন্য।

একটু কাছে আসতেই লোকগুলো হঠাৎ এমন চমকে গেল যে অন্ধকারের মধ্যে বলটুদা পা মাড়িয়ে দিতেই একেবারে লোকটাকে জাপটে ধরলো।

: ছেড়ে দিন—ছেড়ে দিন স্যার আমি গোবর্ধন —কুট্টি পিসীর আত্মীয় বলেই গোবর্ধন হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললো। ওর দায়োয়ানী গোঁফ

বেয়ে টপ-টপ করে বিষ্টির জলের মত ধারা নামলো : কুট্টি পিসির লাস তো আমারই ঘরে ছিল স্যার—

বলটুদা একটু থতমত খেয়ে বললে : তাই যদি হবে তবে এতক্ষণ বলতে কী হচ্ছিল শুনি ?

: বলবো কি করে বলুন ? আপনাদের দেখে ভয়ে বুকের রক্ত শুকিয়ে আসছিল। আপনারা যে গুপ্তধন এবং কুট্টিপিসির মৃত্যুর রহস্য ভেদ করবার জন্যে এখানে এসেছেন তাতো আমার জানা ছিল না।

: এখন তো জানলেন। যাক্ ও তাহলে আমরা দুজনে মিলেই একত্রে কাজ করবো। এতে আপনাদের কাজের সুবিধাই হবে।

: তা হবে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করে দেখুন সামনে ওরা একটা ম্যাপ দেখছে এবং আমার দোতলা ঘরের মধ্যে থেকে লোপাট হয়ে যাওয়া কুট্টিপিসির লাসটা ঠিক তেমনি করে চটে জড়ান অবস্থায় ও দেরসামনে পড়ে আছে। ওরা বলল কী পরামর্শ করছে। মাঝে মাঝে কথা বলছে—মাঝে মাঝে মাথায় হাত রেখে কি যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে যাচ্ছে।

বলটুদা বললে : থাম বেশী হুড়-মুড় করো না। এখন আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ অত্যন্ত মেপে জুখে ফেলতে হবে নইলে একটু অসাবধানতা আমাদের সমুহ সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে।

ওরা খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একটা ঘরে পৌঁছলো ঘরটা ছোট কিন্তু প্রচুর দরজা জানলা। কিন্তু সব কটাই বন্ধ। একটা বন্ধ জানলার ভাঙ্গা অংশ দিয়ে বলটুদা কি যেন বেশ মন দিয়ে নিরীক্ষণ করে নিয়ে গোবর্ধনকে বললে : এবার আপনি ওই ফুটোর মধ্যে চোখ লাগিয়ে বেশ ভাল করে দেখুন তো।

গোবর্ধন চোখ লাগালো।

: কী দেখছেন।

: একটা কালো রঙের গোল টেবিল।

: তারপর— ?

: তার ওপর কি যেন একটা—

: কী যেন একটা কী মশায়—? ভাল করে দেখুন।

: একটা ম্যাপই বটে। গোটা চার পাঁচ জন লোক সেটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে বেশ মন দিয়ে দেখছে।

: হ্যাঁ—ওটাই ম্যাপ। এবং ওটার মধ্যেই গুপ্তধনের সমস্ত রহস্য লুকিয়ে আছে।

: কিন্তু মেজেতে পড়ে আছে যে চট জড়ানো লাসটা—তার যেন বেশ খানিকটা দাড়ি চটের ভেতর থেকে দেখা যাচ্ছে।

: যাক্। রেগে বলটুদা বললে। দাড়ি থাকলেই কি কুট্টিপিসি হতে নেই—একথা আপনাকে কে বল্ল। দেখুন তো ভাল করে তরমুজের বোঁটার মত একটা টিকিও তো দেখা যাচ্ছে। তাতে হয়েছেটা কী—ও সব ছেড়ে দিন। ওটা আলবাৎ আপনার কুট্টিপিসি এবং ও লোকগুলো গুপ্তধনের লোভেই তাঁকে খুন করেছে—

: কিন্তু আমার মত একটা অধম লোকের ঘরের ভেতরেই বা কেন এনে দিয়ে গেল রাত

দুপুরে। আর যদি দিয়েই গেল তবে আবার মুহূর্তে পি সি সরকারের ম্যাজিকের মত তাকে ভ্যানিস করে দিল কেন?

: হবে—হবে সব হবে। আগে গুপ্তধনের রহস্য ভেদ হোক তারপরে কুট্টিপিসির ব্যাপারটার সমাধান হতে দেরী হবে না।

কিন্তু ওরা এগোবে কী করে? সাড়া পেলেই তো লোকগুলো ছুটে পালাবে। আর ওদের সঙ্গে তেমন কোন অস্ত্র-শস্ত্র নেই। আর ওদের কাছে যদি বোমা—পিস্তল এ সব থাকে? তা হলে?

গোবর্ধন বললে: তা ঠিক, আমাদের সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্র কিছু নেই। কিন্তু ওরাও তো বেশী লোক নয়। আপনি যদি একটু অপেক্ষা করেন, আমি এখুনি জনাপাঁচেক লোক সঙ্গে করে নিয়ে আসছি। আমার কাকা ছিদাম মুদিরদোকান কাছেই। ওঁর গদিতে অনেক লোক আছে। একটা ভোজপুরী দারোয়ান আছে সেও এক একটাকে ধরে খেয়ে ফেলতে পারে। যদি বলেন এই গেলাম আর ওদের নিয়ে এলাম বলে।

: যাও কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি আসবে। আমি কিন্তু একা রইলাম। তা ছাড়া এখানে বড্ড মশার উৎপাত। বেশীক্ষণ বসা হয়তো সম্ভব হবে না। তার ওপর দারুণ পোকার উপদ্রব। নাকে চোখে মুখে এসে ঢুকছে। খুব তাড়াতাড়ি আসতে হবে মনে রেখে একেবারে ছুটে যান তীর বেগে।

রাতটা কালো; দারুণ কালো আর অন্ধকার। তাড়াতাড়ি পথ চলা যায় না। কিন্তু গোবর্ধন তারই মধ্যে ছুটে চললো। এদিকে বলটুদা একা আছে—তারও চিন্তা। —সুতরাং যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়। তা ছাড়া বলটুদাকে যতটুকু সে দেখেছে তার বেশ ভালোই লেগেছে।

বেঁটে কালো, নাকটা টিয়াপাখীর ঠোঁটের মত হলেও মেজাজটা সব সময় সরিফ থাকে। তা ছাড়া এই ঘোরতর বিপদের সময় তাদের দুজনের দেখা এবং ভাব এটাও তো কম কথা নয়। কিন্তু বন্ধুকে বন্ধু না রাখিলে কে রাখিবে? সুতরাং গোবর্ধন ছিদাম মুদীর দরজায় গিয়ে কড়া নাড়লো।

: কে-র‍্যা—। এই রাতদুকুরে বিরক্ত করতে এলি? ভেতর থেকে মোটা গলার আওয়াজ এলো।

: আমি গোবর্ধন! কাকা দরজা খোল। খুব বিপদ।

: হুঁ—হুঁ! দরজা টরজা খুলছিনে বাপু—। আমিও ছিদামমুদি। তেমন বিপদে পড়লে আমি অনেক লোককে কাকা ডাকতে শুনেছি।

: আরে না—না। সে সব নয়। আমি আপনাদের আসল গোবর্ধন। দরজা খুলুন।

কিন্তু তবু ছিদামমুদীর ওঠার বা দরজা খোলার কোনই চেষ্টা দেখা গেল না।

অতএব গোবর্ধনকে অন্য পথ নিতে হলো।

রাস্তার বাঁ দিকে একটা গাব গাছ ছিল। সেদিকের জানলাটা কমজোরী হবার জন্যে ওটা ছিদাম মুদী দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছিল। অনেকবার গোবর্ধন বলেছে: কাকা, জানালাটা মেরামত কর চোরটোর রাত বিরেতে ঢুকে পড়তে পারে। কিন্তু

পয়সা খরচের ভয়ে ছিদাম এতদিন ওটা মেরামত করেনি। সুতরাং আর কোন উপায় না দেখে গোবর্ধন ওই জানালার দড়িটা পটাস করে ছিঁড়ে ফেলে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লো।

ধপাস।—

একটা যেন বিরাট আলুর বস্তা মেঝের উপর গড়িয়ে পড়লো আর সেই মুহূর্তে ছিদামমুদীকে বোবায় ধরলো। সে—চোর · র—র বলেই বো—বো করতে থাকলো।

দারোরান ছুটে এলো এবং অন্ধকারে গোবর্ধনের গলা টিপতে গিয়ে নিজের খানিকটা গোঁফই সজনে ডাঁটার মত চিবিয়ে ফেলে বললে: দাদাবাবু—আরে রামজী—।

গোবর্ধন বললে: সৌজন্যের আর দরকার নেই। তুই তোর দুই ভাতিজাকে নিয়ে এখুনি আমার সঙ্গে আয়। ওদিকে দারুণ বিপদ। কাকা বাবুর কিছু হয়নি। বোবায় ধরেছে এখুনি ঠিক হয়ে যাবে। সুতরাং আর এক মিনিটও দেরী নয়। ছুটে চল—কুইক—

ওরা যখন সদলবলে গিয়ে পৌছলে তখন চার দিকে ঘন অন্ধকারের চাদরে মোড়া বিরাট অট্টালিকাটা যেন থম থম করছে।

ওরা খুব সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে ভেতরে ঢুকলো। তারপর এ ঘর ও ঘর করে পর পর পাঁচটা ঘর পার হয়ে যখন সেই ঘরটিতে পৌছলো তখন অন্ধকারের মধ্যেও বুঝতে ভুল হল না সে ঘেরটার ভেতর কেউ নেই।

বলটুদা।—

গোবর্ধন চাপা গলায় ডাকলো।

কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

আবার কাঁপা কাঁপা গলায় ডাকলো: বলটুদা, একটা প্রকাণ্ড হুলো বেড়াল তারিবৎ করে সাড়া দিল। ম্যাও—ও—ও।

সামনের দিকের ভাঙ্গা জানলা দিয়ে গোবর্ধন দেখলে যে ঘর বেশ কতগুলো লোক সলা পরামর্শ করছিল তারা কেউ-ই নেই—। সামনের দরজা খোলা। দরজার ওপর একটা নেড়ীকুত্তা বসে আছে। ওরা অনেকক্ষণ আগেই চলে গেছে সবাই।

( ক্রমশঃ )

---

## গোয়েন্দা ধাঁধা

নানা ধরণের তদন্তমূলক ঘটনার ছোট ছোট অংশ,—গোয়েন্দার ধাঁধা প্রভৃতি, তোমাদের যদি কারো জানা থাকে পাঠাতে পারো আমাদের দপ্তরে। সমাধান দিয়ে পাঠাবে। ভালো হলে নিশ্চয়ই ছাপানোর চেষ্টা করবো।

# বানরের থাবা

বাবু মুখোপাধ্যায়

( বিদেশী গল্পের ছায়ায় )

একে শীতকাল তার ওপর বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া, তাই সবগুলো জানলা দরজাই ভেতর থেকে বন্ধ। ঘরের মধ্যেটা অবশ্য যথেষ্ট উত্তপ্ত, কারণ একটা উনুন জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে এক পাশে। একজন মহিলা তার পাশে বসে আপন মনে উল বুনছেন। ঘরে উপস্থিত অন্য দুজন গভীর ভাবে দাবা খেলায় মশগুল।

'হাওয়ায় কি শব্দ শুনেছিস!' দাবাড়ুদের মধ্যে বয়স্ক ব্যক্তিটি এক সময় বলে উঠলেন। আসলে কথাটা বলার উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষকে সাময়িক অন্যমনস্ক করে দেওয়া, কারণ এইমাত্র তিনি একটা ভুল চাল দিয়ে ফেলেছেন।

তাঁর প্রতিপক্ষ কিন্তু ব্যাপারটা আন্দাজ করে মনে মনে হাসলো, মুখে অবশ্য বললো, 'আমি শুনছি, বাণী। এই নাও, সামলাও তোমার মন্ত্রী।'

ও প্রান্তে বসা মহিলাটি এবার মুখ খুললেন, 'তোমার বন্ধু বোধহয় আজ আর আসছেন না। একে বিশ্রী আবহাওয়া, তার ওপর এই জঘন্য এলাকা—কি দেখে যে তুমি বাড়িটা—'

সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হতে কথাটা তিনি শেষ করতে পারলেন না। তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে উঠে কৌশিক দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। পরক্ষণেই যিনি ঢুকলেন তাঁর পরণে হাঁটু পর্যন্ত ওভারকোট, মাথা মুখ সইটাই টুপিতে ঢাকা, একমাত্র নাকের ডগাটুকু আর দুটো চোখ কেবল খোলা।

আগন্তুককে দেখেই ব্যারিস্টার বোস উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, 'আরে এসো এসো মেজর সাহেব, অনেকদিন বাঁচবে, এইমাত্র রমা তোমার কথা বলছিলো।'

মেজর চৌধুরী টুপি খুলে ওভারকোটের পকেটে ঢুকিয়ে নিলেন। 'যা অবস্থা, বাড়ি থেকে বেরোবো কি করে ভাবছিলাম। রমা, আমাকে কিন্তু চা খাওয়াতে হবে।'

'নিশ্চয়ই।' উলের কাটা নামিয়ে শ্রীমতী বোস উঠে দাঁড়লেন। 'চা আমার ফ্লাস্কে রেডি। আমি এক্ষুনি দিচ্ছি, আপনি বরং ততক্ষণে বানরের থাবার গল্পটা শুরু করুন।'

'বানরের থাবা?' কৌশিক অবাক চোখে তার মেজর কাকার দিকে তাকালো। মেজর চৌধুরী কৃত্রিম রোষে বন্ধুর দিকে তাকালেন। 'অ। এই জন্যেই বোধহয় আমাকে অত ঘটা করে ডেকে পাঠিয়েছিলে? তোমায় না বলেছিলাম কথাটা চেপে রাখতে?'

ব্যারিস্টার বোস মৃদু হাসলেন। 'আরে বাপু, চেপে রাখবো কি নিজের স্ত্রীর কাছেও? তবুও ছাখো কৌশিককেও আমি কিছু বলিনি।'

কৌশিক অধৈর্য হয়ে ওঠে, 'কি ব্যাপার, বলুন না কাকা?'

মেজর চৌধুরী হাত ঝাঁকিয়ে বিষয়টা উড়িয়ে দিতে চাইলেন, 'আরে ও কিছু নয়, তুমি বাবার কাছেই শুনে নিও।'

ইতিমধ্যে শ্রীমতী বোস চা নিয়ে এসেছেন। কাপ টেবিলে নামিয়ে বললেন. 'ওসব হবে না ঠাকুরপো, আপনার মুখ থেকেই আমরা শুনবো। আপনার বন্ধুর কোন কিছুই গুছিয়ে বলার ক্ষমতা নেই।'

ব্যারিষ্টার বোস তৎক্ষণাৎ স্ত্রীকে সমর্থন করে উঠলেন, নিশ্চয়ই, 'আমি সেটা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করে নিচ্ছি।'

'বেশ, তাই হোক।' মেজর চৌধুরী ওভার কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে কিছু একটা টেনে আনলেন। 'এমন কিছুই নয় জিনিসটা—এটা একটা মরা বানরের থাবা।'

ঘেন্নায় নাক কোঁচকালেন শ্রীমতী বোস। কৌশিক কিন্তু থাবাটা হাত থেকে তুলে নিলো। ছোট্ট লোমশ একটা বস্তু, শুকিয়ে প্রায় পাথরের মতো হয়ে উঠেছে।

'জিনিসটা প্রথমে এক সাধুর কাছে ছিলো। এরপর তিন জনের হাত ঘুরে আমার কাছে এসেছে। এর অবশ্য একটা মাহাত্ম্য আছে। এটা যখন যার কাছে থাকবে, তার যে কোন তিনটে মনস্কামনা এ পূরণ করে দেবে।'

মেজর চৌধুরী থামলেন। ঘরে থমথমে নীরবতা। তিনজন শ্রোতা অধীর আগ্রহে তাঁর দিকে তাকিয়ে। অবশেষে কৌশিক সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করলো, 'তা জিনিসটা যখন আপনার কাছে রয়েছে, আপনি নিজের মনস্কামনাগুলো মিটিয়ে নিচ্ছেন না কেন?'

'নিয়েছি। তিনটে ইচ্ছেই আমার পূরণ হয়ে গেছে।'

'তাহলে আর ওটা কাছে রেখেছেন কেন?' এবার শ্রীমতী বোস প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, তা বলতে পারো, এটা এখন আমার কাছে মূল্যহীন। মাঝে একবার বিক্রী করে দেবোও ভেবেছিলাম, কিন্তু কিনবে কে? এসব জিনিসে আজকাল তো কেউ চট্ করে বিশ্বাস করে না।'

কৌশিক বললো, 'আচ্ছা কাকা, এটা তিন হাত ঘুরে আপনার কাছে এসেছে বললেন। ওঁরা তিনজনও কি নিজেদের ইচ্ছেগুলো পূরণ করতে পেরেছিলেন?'

'প্রথম দুজনের কথা জানি না, তবে শেষের জন করেছিলো এবং শেষ অব্দি তার মৃত্যু হয়। সেই থেকেই জিনিসটা আমার কাছে। অবশ্য আর এটা আমি কাছে রাখতে চাই না।' বলেই থাবাটা কৌশিকের হাত থেকে নিয়ে মেজর চৌধুরী উনুনের ওপর চাপিয়ে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে এক লাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে ব্যারিস্টার বোস সেটা ছোঁ মেরে আবার তুলে

নিলেন। 'চৌধুরী, জিনিসটার যদি তোমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়ে থাকে, ওটা বরং আমাকেই দিয়ে দাও।'

না বোস, তা আমি দিতে পারি না। আমি ওটা আগুনে ফেলে দিয়েছি, তুমি আবার সেটা কুড়িয়ে এনেছো। এবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তোমার এরপর যদি কিছু হয়ে যায়, তার জন্যে দায়ী তুমি, আমি নই। তবে আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, ওটা পুড়িয়ে ফেলো।'

ব্যারিস্টার বোস সজোরে মাথা নেড়ে ওঠেন। 'না। তার আগে আমি নিজে ব্যাপারটা একবার পরীক্ষা করতে চাই। বলো, কি করতে হবে?'

'ওটা ডান হাতে ধরে, তোমার যা মনস্কামনা, সেটা চেঁচিয়ে বলতে হবে। কিন্তু আমি আবার বলছি, এতে কিন্তু তোমার প্রচণ্ড ক্ষতি হয়ে যাবে।'

'হোক, তবু আমি পরীক্ষা করবো।'

'বেশ, তাহলে আমি চলে যাবার পর বরং পরীক্ষা কোরো।'

মেজর চৌধুরী চা শেষ করেই বিদায় নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে থাবাটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো তিনজন।

কৌশিক বললো, 'বাপী, তুমি বরং লাখপতি-টাথপতি হবার মতো কিছু কামনা করো।'

'না না, অত সুখে কাজ নেই,' শ্রীমতী বোস বললেন। 'তুমি বরঞ্চ একটা ভালো বাড়ির কথা বলো। আর এলাকাটা যেন ভালো হয়।'

'ওসব পরে হবে, আমার দু হাজার টাকা দেনা আছে, সেটা আগে মিটিয়ে নিই।' বলেই থাবাটা হাতে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন ব্যারিস্টার বোস, 'হে থাবা বাবা, আমায় দু হাজার টাকা জুটিয়ে দাও দেখি।'

কথাটা শেষ করেই হঠাৎ এক আর্তনাদ তুলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। 'উঃ, আমার ডান হাতটা কে যেন মুচড়ে দিলো!'

শ্রীমতী বোস তাড়াতাড়ি স্বামীর দিকে ঝুঁকে পড়লেও কৌশিক কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই বিশ্বাস করলো না। বললো, 'ও তোমার মনের ভুল, বাপী। কিন্তু কাকার কথা যদি সত্যিই হয়ে থাকে, টাকা কোথায় এলো?'

'তুই থাম তো!' ছেলেকে ধমকে উঠলেন শ্রীমতী বোস, স্বামীর দিকে ফিরে বললেন, 'হ্যাঁ-গো, এটা সেই বাতের ব্যাথাটা নয় তো?'

ব্যারিস্টার বোস গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ে 'না, রমা, ঠিক আছে তোমরা যাও।'

কৌশিক বলে উঠলো, 'মা, কটা বেজেছে খেয়াল আছে? আমাকে নাইট ডিউটিতে বেরোতে হবে না?'

পরের দিন সকাল। চায়ের টেবিলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কথা চলছে। শ্রীমতী বোস বলছিলেন, 'যাই বলো তুমি, মিলিটারির লোকেরা সব কিছুই একটু অতিরঞ্জিত করে বলতে ভালবাসে। কাল আচ্ছা গাঁজাঘুরি গল্পই শুনিয়ে গেলো তোমার বন্ধু।'

'চৌধুরী আর যার কাছেই বানিয়ে বলুক, আমার কাছে অন্তত বলবে না, এটুকু বিশ্বাস আমার আছে, রমা।'

ঠিক এই সময় সজোরে কড়া নড়ে উঠলো। শ্রীমতী বোস দরজা খুলে দিলেন। ২৫-২৬ বছরের তিনটি তরুণ ঘরে ঢুকলো। তাদের একজন বললো, 'আ-আমরা ম্যাকেনরো অ্যাণ্ড সন্স থেকে আসছি।'

শ্রীমতী বোস চমকে উঠলেন। 'কী ব্যাপার, কৌশিকের কিছু হয়েছে?'

ব্যারিস্টার বোস সামলে নিয়ে বললেন, 'আগে ভেতরে এসে বসো তোমরা। বুঝতে পারছি কোন খারাপ খবর নিয়ে এসেছো।'

তিনজনে জড়োসড়ো হয়ে সোফায় বসলো। 'আমরা মানে—'

'ওর কি কোথাও চোট লেগেছে?' শ্রীমতী বোস আবার প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ মানে খুবই রেশি রকম—'

'এখন কেমন আছে?'

তিনজনেই চুপচাপ।

কি ব্যাপার? তোমরা কিছু বলছো না কেন? কি হয়েছে কৌশিকের?

'বলছি, আগে এই টাকাটা রাখুন। আমার বোনের বিয়ের জন্যে কৌশিক আমায় দু হাজার টাকা ধার দিয়েছিলো। গতকাল লোনের টাকা ফ্যাক্টরি থেকে পেয়েছি—'

'কিন্তু কৌশিক কোথায়?'

'ও—ও আর নেই, মাসীমা। মেশিনে কাজ করার সময় অসাবধানে হঠাৎ পিছলে পড়ে—'

'য়্যাঁ? সে কী। কী বলছো—' আর কিছু বলতে পারলেন না শ্রীমতী বোস, সশব্দে মেঝের ওপর পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

এই সাংঘাতিক মানসিক অবস্থাতেও ব্যারিস্টার বোস মনে মনে হাসলেন। তাঁর বন্ধুর কথা মিথ্যে হয়নি। যত যাই হোক থাবার দৌলতে দু হাজার টাকা তো জুটেছে!

এর পর এক সপ্তাহ কেটে গেছে। এই কদিন ব্যারিস্টার বোস দিনে রাতে দু-তিন ঘণ্টার জন্যেও চোখের পাতা এক করতে পারেন নি। প্রতি রাত্রে বিছানায় কান্নার শব্দ পেয়ে উঠে বসেছেন। অনবরত ডুকরে ডুকরে কেঁদে চলেছেন তাঁর স্ত্রী, ছেলের শোকে খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছেন। শুকিয়ে শরীর কঙ্কালসার, বুকের পাঁজরগুলো পর্যন্ত গোনা যায়।

সেই রাত্রে ব্যারিস্টার বোসের সবে তন্দ্রা এসেছে এমন সময় প্রবল ঝাঁকুনিতে তাঁর ঘুম চটকে গেলো। ধড়মড় করে উঠে বসে দেখেন সামনেই তাঁর স্ত্রী।

'হ্যাঁ গো, থাবাটা কোথায়?' অদ্ভুত চাপা গলায় কথা বলছিলেন শ্রীমতী বোস।

'কেন, কী হলো?' ব্যারিস্টার বোসের গলায় স্বরেই বোঝা গেলো এই ভাবে ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়াতে বিরক্ত হয়েছেন।

'আমায় ওটা চাই— এক্ষুনি।'

'কিন্তু কেন বলবে তো?'

'এইমাত্র আমার খেয়াল হলো। আচ্ছা তোমার মাথায় আসেমি কথাটা?

'আচ্ছা মুসকিল তো। কী ব্যাপার বলো

তো ?'

শ্রীমতী বোস হাসির মতো একটা রেখা মুখে ফোটালেন। 'ওটা দিয়ে আমরা এখনো ছুটো ইচ্ছে পূরণ করতে পারি—ঠিক তো ?'

'কেন, এখনো কি তোমার সাধ মেটেনি ? আরো ইচ্ছে আছে ?' ব্যারিস্টার বোস তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ করে উঠলেন।

'হ্যাঁ' দৃঢ় গলায় জবাব দিলেন শ্রীমতী বোস। 'আরো একটা ইচ্ছে আমরা পূরণ করবো। যাও, ওটা দিয়ে নিজের ছেলেকে বাঁচিয়ে তোলো।'

'কী বলছো, রমা ?' ব্যারিস্টার বোস হতভম্ব। 'তুমি পাগল হয়ে যাও নি তো ?'

'যা বলছি তাই করো। ওঠো, তাড়াতাড়ি।'

'কিন্তু সাতদিনের ওপর হলো সে মারা গেছে। আর তাছাড়া, তুমি তো শেষ সময় ছাখোনি, শুধু পোশাকগুলো ছাড়া তার আর কিছু চেনার ছিলো না।'

'হোক। তবু তুমি যাও। তোমার কি ধারণা, নিজের ছেলেকে দেখে আমি ভয় পাবো ?'

মন্ত্রমুগ্ধের ওপর বিছানা ছেড়ে উঠে ব্যারিষ্টার বোস আলমারির দিকে এগিয়ে গেলেন। এরকম অসম্ভব একটা ব্যাপারে মন সাড়া দিচ্ছে না তবু কাজটা করতে হবে। কিন্তু রমারই বা এত গোঁয়ার্তুমি কেন ?

কিন্তু থাবাটা নিয়ে ফিরে এসে দেখলেন, ওর মুখটাও চকের মতো সাদা হয়ে উঠেছে। উত্তেজনায় চোখ ছুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায় যেন।

'বলো !' কোনক্রমে বললেন শ্রীমতী বোস।

'রমা শোনো, এটা ভালো হচ্ছে না।'

'আমি যা বলছি তাই করো।'

নিরুপায় ব্যারিস্টার বোস থাবাটা হাতে নিয়ে বলে উঠলেন, 'আমার ইচ্ছে ছেলে আবার বেঁচে উঠুক।'

কথাটা শেষ করেই তিনি দড়াম করে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়লেন। থর থর করে তাঁর সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগলো। স্বামীর দিকে এক ঝলক তাকিয়ে শ্রীমতী বোস জানলার কাছে এগিয়ে গেলেন।

বাইরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, ভেতরে থমথমে নীরবতা। হারিকেনের আলোয় ঘরের জিনিসপত্র-গুলোকে রহস্যময় মনে হচ্ছে। টাইমপিসের টিক্ টিক শব্দটাও ব্যারিস্টার বোসের কানে অসহ্য ঠেকছিলো। ইচ্ছে হচ্ছিলো এক্ষুনি আছড়ে ভেঙে ফেলেন। সহসা একটা ইঁদুর দ্রুত বেগে ঘরের এপাশ থেকে ওপাশে ছুটে গেলো। শ্রীমতী বোস চমকে উঠে স্বামীর কাছে ফিরে এলেন।

এর পর অসহ্য একটা মিনিট। ছুজনে নির্বাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছেন। এমন সময় এক তলায় সদরে কড়া নড়ে উঠলো।

দপ করে একবার জ্বলে উঠে হারিকেনটা নিভে গেলো হঠাৎ। ঘুটঘুটে অন্ধকার নেমে এলো ঘরের ভেতরে।

আবার কড়া নাড়ার শব্দ। আরো জোরে এবার।

'কে—কে এলো এত রাত্রে ?' রমা বোস ভয়ার্ত গলায় বলে উঠলেন।

'ও কিছু নয়, ইঁদুর-টিঁদুর হবে।'

কয়েক সেকেণ্ড পরে আবার একবার কড়া নাড়ার শব্দ হলো। যেন প্রচণ্ড বিরক্তির সঙ্গে কড়াটা ধরে নাড়াচ্ছে কেউ।

সহসা শ্রীমতী বোস চিৎকার করে উঠলেন, 'ওগো আমার কৌশিক!—কৌশিক এসেছে আমার কাছে!'

'আঃ রমা, পাগলামি কোরো না!'

'কি বলছো তুমি? কৌশিককে তুমি ডাকোনি? ছিঃ! নিজের ছেলের সম্বন্ধে তোমার এতো ভয়? বেশ, আমিই যাচ্ছি।' বলেই এক দৌড়ে সিঁড়ির কাছে ছুটে গেলেন শ্রীমতী বোস।

ব্যারিস্টার বোস পেছন থেকে চিৎকার করে উঠলেন, 'রমা, যেয়ো না! যেয়ো না বলছি।'

কিন্তু শ্রীমতী বোস ততক্ষণে অন্ধকারের মধ্যেই নিচে নেমে গেছেন। একতলা থেকে তাঁর গলা ভেসে এলো: 'ওগো তুমি একবার নিচে এসো। আমি ছিটকিনি খুলতে পারছি না!'

ব্যারিস্টার বোস তখন পাগলের মতো অন্ধকার হাতড়ে মেঝেতে পড়ে থাকা বানরের থাবাটা খুঁজছেন। একটু আগে সেটা তাঁর হাত থেকে পড়ে যায়।

এদিকে দু-তিনবার ডাকাডাকি করেও স্বামীর গলা না পেয়ে শ্রীমতী বোস আবার ওপরে উঠতে শুরু করেছেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তে থাবাটা পেয়ে গেলেন ব্যারিস্টার বোস। স্ত্রী ঘরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে নিজের তৃতীয় ইচ্ছেটা বলে ফেললেন তিনি: 'কৌশিক, তোমাকে আমাদের আর প্রয়োজন নেই। ফিরে যাও তুমি!'

'এ তুমি কি করলে গো!' বলেই আবার আছড়ে মেঝের ওপর পড়ে গেলেন শ্রীমতী বোস। 'আমার কী সর্বনাশ তুমি করলে!'

আর ঠিক তখনই নিচের সদর দরজাটা দড়াম করে খুলে গেলো। কোথা থেকে একটা দমকা বাতাসের হলকা ছুটে এলো ঘরের ভেতর। বাতি-স্তম্ভের আলোয় দুজনেই দেখলেন রাস্তাটা সম্পূর্ণ জনশূন্য, ফাঁকা।

———

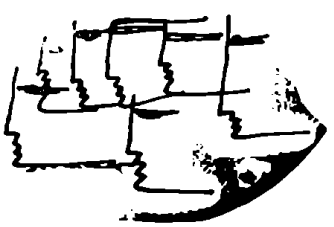

*বলতো কি ছবি আঁকা?*

*উত্তর পাঠাও—*

# অটোগ্রাফের কাহিনী

গোপালদাস মুখোপাধ্যায়

তোমাদের ভেতরে অনেকেরই অনেক কিছু 'হবি' আছে, বাংলায় যাকে বলে নেশা। কারোর আছে ষ্ট্যাম্প জমানো, কারোর আছে দেশলাইয়ের খোল জমানো, কারোর আছে বিয়ের চিঠি জমানো, কারোর আছে প্রজাপতিকে ধরে রাখা। আবার কারো কারো বড় বড় মনীষীদের সই সংগ্রহ করা। সেই সই সংগ্রহ করা থেকেই বড় বড় খেলোয়াড়দের সই সংগ্রহ করা এসেছে। তোমাদের ভিতরে কেউ বড় বড় ফুটবল খেলোয়াড় বা ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সই সংগ্রহ করো। এই ক্রিকেট খেলোয়াড়ের সই সংগ্রহ করা ছিল না আগে এবং তারা সইও দিতেন না। তখনকার দিনে কোন খেলোয়াড় কোন খেলাতে যদি বিশেষ কোন পারদর্শিতা দেখাতেন তাকে একটি ব্যাট পুরস্কার দেওয়া হত। এই প্রথম পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল আজ থেকে ঠিক একশত বৎসর আগে। প্রথম ইংল্যাণ্ডের মাটিতে অর্থাৎ ওভালে ইংল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়াকে পাঁচ উইকেটে হারায়। ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক ডবলু জি, গ্রেস করছিলেন ১৫২ রান। এই ডবলু, জি, গ্রেসকে এখন পর্যন্ত সকলে ক্রিকেটের ঠাকুরদা বলে থাকেন। তেমনি আমাদের বাংলা ক্রিকেটেও ওই রকম একজনকে ঠাকুরদা বলা হয়। তাঁর নাম প্রিন্সিপাল সারদা-রঞ্জন রায়। এই সারদাবাবুর সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের সম্পর্ক ছিল। ফিরে আসি ডবলু, জি, গ্রেসের কথায়। ওনার যখন ষোল বছর বয়স সেই সময় তিনি সাউথ ওয়েলস্ এর হয়ে খেলে সাক্সেস দলের হয়ে খেলে ১৭০ ও ৫৬ রান নট আউট করেছিলেন। তাঁকে সাক্সেস দলের সেক্রেটারী একটি ব্যাট উপহার দিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল, "এই ব্যাট জন লয়েট, সেক্রেটারী সাউথ ওয়েলস্ কাউন্টি ক্লাব কর্তৃক ডবলু, জি, গ্রেসকে প্রদত্ত হইল, যিনি কোন সুযোগ না দিয়ে ১৭০ ও ৫৬ রান নট আউট করেছেন সাক্সেস-এর বিরুদ্ধে হোভ মাঠে। খেলাটা হয়েছিল ১৪, ১৫ ও ১৬ই জুলাই ১৮৬৪ সালে।" এবং ব্যাটের ওপরে ক্লাবের ব্যাজটাও আঁটা ছিল। কিন্তু এখন আর ক্লাবের ব্যাজ আঁটা বা কিছু লেখা হয় না। এখন শুধু দু'দলের খেলোয়াড়দের নাম সই করা হয়।

এই ব্যাটেতে নাম সই করা থেকেই খাতায় নাম সই করা আরম্ভ হলো, যা তোমরা এখন নিয়ে থাকো। এখানে একটা মজার গল্প আছে থিয়েভ ওয়ালটারস্, উরসচার দলের অধিনায়ক ছিলেন। তিনি কেণ্ট-এর বিরুদ্ধে খেলছিলেন। কেণ্ট দলের অধিনায়ক ছিলেন বি, এইচ, ভ্যালেনটাইন। সেই সময় একটি ছেলে ওই ভ্যালেনটাইন এর দলের সই নেবার জন্য আসে। সকলেই তাকে নিরাশ করে সে কিন্তু ভ্যালেনটাইনকে চিনত না। সে ওয়ালটারস-এর কাছে যেতে ওয়ালটারস কিন্তু রাজি

হয়েছিলেন সই দেবার জন্য এবং কলমও ধরেছিলেন আর বলেছিলেন আমার নাম কিন্তু ওয়ালটারস্। ছেলেটি তখন হাত থেকে খাতাটা কেড়ে নিয়েছিল, কলমটাও কেড়ে নিয়ে রেগে চলে যায় এবং বলে না না তোমার সই-এর দরকার নেই। পরে ফিরে এসে ওয়ালটারস-এর কাছে ক্ষমা চেয়েছিল। তখনকার দিনে অনেকে আবার ডাক নামে বা অন্য নামেও সই করতেন। যেমন, ভিক্টর সই করতেন মাইচাস্ নামে। আমাদের দেশেতে ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সই নেবার প্রচলন আরম্ভ হয় ১৯২৬-২৭ সাল থেকে। যখন এম, সি, সি দল এদেশে খেলতে আসে। এর আগে তিনটি ইংল্যাণ্ড দল খেলে গেছে তাঁদের কিন্তু কেউ সই নেয় নি। আর আজকে একটা ক্রিকেট দল খেলতে এলেই তাদের খেলোয়াড়দের হাজার থেকে দু' হাজারেরও বেশী খাতাতে সই দিতে হয়। এই হচ্ছে "অটোগ্রাফের কাহিনী।"

# ছড়া ও আঁক প্রতিযোগিতা

ঢাকুরিয়া নিবাসী সুমন দত্ত চিলড্রেনস্ ডিটেক্‌টিভ-এর মাসিক ছড়া ও আঁকা প্রতিযোগিতার পুরস্কার দিতে ইচ্ছুক। তার এই প্রস্তাব সাগ্রহে গ্রহণ করে জুলাই এবং আগষ্ট সংখ্যা—সুমন দত্ত ছড়া ও আঁকা প্রতিযোগিতা আয়োজন করলাম। ছড়া পুরস্কার ১৫ টাকা। আঁকা পুরস্কার ১০ টাকা। ছড়ার কোন নির্দিষ্ট বিষয় বস্তু নেই। একজন প্রতিযোগী একটি ছড়া বা আঁকা পাঠাতে পারবে। লেখা পাঠাবার খামের উপর সুমন দত্ত ছড়া ও আঁকা প্রতিযোগিতা কথাটি উল্লেখ করে দেবে। প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত ছড়া ও আঁকা দুটি রচয়িতার নাম সহ পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে। পুরস্কারের টাকা M. O. যোগে পাওয়া হবে। ছড়া ও আঁকা পাঠাবার শেষ তারিখ ২৯শে আগষ্ট ১৯৮০।

বিঃ দ্রঃ—চিলড্রেনস্ ডিটেক্‌টিভ গ্রাহকদের মধ্যে যে কেউ এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে অর্থাৎ ২৫ টাকা সহ এক কপি পাসপোর্ট ছবি পাঠালে প্রকাশ করব এবং সেই নামে প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হবে।

এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবার পর যারা আগে ছবি সহ টাকা পাঠাবেন, তারাই এতে অগ্রাধিকার পাবেন।

মে সংখ্যা জিৎ বোস প্রতিযোগিতা ফলাফল ছড়া—গোপাল মজুমদার। বয়স ১১ বৎসর, ধামুয়া ২৪ পরগণা। ছবি ( বুলটা ) দত্ত—বয়স ১২ বৎসর, শিবপুর হাওড়া।

# বকখালির রহস্য

—শ্যামল বসু—

সময়টা ডিসেম্বরের শেষের দিকে। ঠাণ্ডাটা অন্যদিনের তুলনায় একটু বেশী পড়েছে। তাই অফিস থেকে এসে বাইরে বেরুলাম না। সোজা জলখাবার খেয়ে বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিতে থাকি। শীতের সময়। জানলা-দরজা বন্ধ করা আছে। রিষ্টওয়াচের দিকে চোখ বোলাতে, বুঝলাম সময়টা এখন পৌনে সাতটা। বুক সেলফের থেকে একখানা বই বার করলাম যার উপাধিখানা হলো —"দুঃসাহসিক অভিযান।" একখানা অ্যাড-ভেঞ্চারের বই। বইটা খুলে সবে মনোনিবেশ করছি। এমন সময় বাইরের দরজায় করাঘাত। বিরক্ত হয়ে উঠে দেখি, সুমিত। সুমিত সাহা। আমার এ্যাডভেঞ্চার জীবনের সুখ-দুখের সাথী। 'শয়তানের জাল' থেকে বহু বিপন্ন মানুষকে উদ্ধার করেছি এই সুমিত সাহার সাহায্যে। স্বল্পভাষী, বুদ্ধিমান ও মেধাবী কিশোর এই সুমিত সাহা। আমাকে দাদার মতো দেখে, বন্ধুর মতো মেশে আর বোধহয় প্রাণের চেয়ে বেশী আমায় ভালোবাসে। সাদর অভ্যর্থনা করে ওকে ঘরে নিয়ে এলাম। বললাম, "আবার কোন রহস্যের গন্ধ তোমার নাকে গেছে? আমার বিছানাতে বসতে বসতে মৃদু হাসি হেসে জবাব দিল—"না এখন আর রহস্য উদ্ঘাটনের ইচ্ছা নেই। রীতিমত ভাঁটা পড়েছে।" অর্থাৎ সুমিতের বক্তব্য হলো রহস্য-টহস্য তার কাছে একঘেয়েমী লাগছে। ওর সাথে তাল মিলিয়ে বললাম—"আমারও তোমার মত দেখছি বেশ কয়েকদিন একঘেয়েমী ভাবে জীবনটা কাটছে। তা ছাড়া অফিসের কাজের চাপে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি বেশ কয়েকদিন যাবৎ।" আমার কথা শেষ হতেই সুমিত চট্ করে বলল "বেশ তো চলো না, দু'তিন দিনের জন্যে বেশ একটু নিরিবিলিতে ঘুরে আসা যাক।" ওর প্রস্তাবখানা মন্দ নয় ভেবে রাজী হয়ে গেলাম। কোথায় যাওয়া যায় তা নিয়ে বিস্তর চিন্তা করতে থাকি। অবশেষে উভয়েই ঠিক করলাম, যেতে গেলে বকখালিতে যাওয়া যাক। সুতরাং বকখালির দিকে যাবার প্রস্তাবখানা পাকা হয়ে গেল।

শীতের সময়, স্থানখানা বেশ মনোরম লাগবে বলে আমাদের ধারনা। জায়গা শুনেছি বেশ নিরিবিলি। বিশ্রামের পক্ষে সব চেয়ে ভালো নাকি। সুতরাং বকখালি যাবার জন্যে রেডি হতে লাগলাম।

পরের দিন অফিসের ছুটির দরখাস্ত পাঠালাম। ছুটি আমার বেশ কিছুদিনের পাওনা ছিলো। তাই দিন চার পাঁচ দিনের ছুটি আমি অনায়াসে পেয়ে গেলাম। যাবার দিন ঠিক হলো—দোসরা জানুয়ারীতে।

* * *

দোসরা জানুয়ারীর ভোরে সুমিত রেডি হয়ে আমার বাড়ীতে এলো। সাথে হালকা লাগেজ।

কারণ থাকার স্থান আগে-ভাগে বুক করে রেখেছি। বকখালি টুরিষ্ট লজেতে। লজখানা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে। কোলকাতায় ওদের হেড অফিস থেকে আমাদের রুম বুক করলাম। সুতরাং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছাড়া ভারী ধরনের কোন কিছু সাথে করে নিলাম না। যেখানে যাই না কেন সাথে থাকে আমাদের রহস্য অনুসন্ধানের যাবতীয় জিনিস পত্র আগেই রেডি হয়েছিলাম, সুমিত আসতেই বেরিয়ে পড়লাম। সময়টা দেখলাম পৌনে পাঁচটা। শীতের ভোর। সব ফাঁকা, কুয়াশার ভীড় ঠেলে আমরা চলতে থাকি। আমাদের কাছে তখন বেশ মিষ্টি লাগছিল। গোপালনগর থেকে ফার্স্ট ট্রাম ধরে চলে এলাম এসপ্ল্যানেডে সরকারী বাসের গুমটি, যেখান থেকে সব বাস দূরপাল্লায় যায়। সেখান থেকে 'নামখানা'-গামী বাসেতে আমাদের উঠতে হবে। ঝামেলা এড়াবার জন্যে বাসের সিট্ বুকিং করেছিলাম। তাই নিশ্চিন্ত মনে অপেক্ষা করতে থাকি যাবার জন্যে। ফার্স্ট বাস ছাড়বে ছ'টাতে। সেই বাসে আমাদের যেতে হবে।

যথা সময়ে নামখানাগামী বাসখানা আমাদের সামনে হাজির হলো। বাসে উঠে আমরা নির্দিষ্ট সীটে গিয়ে বসলাম। সিজনটা ভালো বলে টুরিস্টদের ভীড়ের চাপটা বেশী। যার ফলে বেশ কিছু স্পেশাল বাস দিয়েছে।

কাঁটায় কাঁটায় সওয়া ছ'টার সময় আমাদের বাসখানা নামখানা অভিমুখে রওনা দেবার জন্যে ছাড়ল। সাথে ব্রেক ফাষ্টের জন্যে নিয়েছিলাম—কলা, পাঁউরুটি, সিদ্ধ ডিম, আপেল ও মিষ্টি। ফ্ল্যাস্কে ভরা ছিলো গরম চা।

বেলা দশটার সময় হাজির হলাম—নামখানাতে ওখান থেকে একখানা মাঝারী ধরনের নদী আছে যাকে স্থানীয় লোকেদের ভাষায় বলে—হাতে দেয়া-নেয়া নদী।" সেই নদীতে খেয়া পার হয়ে ওপারে ফ্রেজারগঞ্জে পড়বে। সেখানে মাত্র একখানা প্রাইভেট বাস রুট আছে, আবার বাস সংখ্যা মাত্র চারখানা। যদি দু' একটা বাস খারাপ হয়ে পড়ে তাহলে ট্যুরিষ্টদের সাথে স্থানীয় লোকেদের চরম অসুবিধার ভেতর পড়তে হয়। যা হোক সেদিন কিন্তু আমাদের কোনরূপ অসুবিধার ভেতর পড়তে হয়নি। যাবার আগে বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে একখানা মিষ্টির দোকান থেকে কিছু খেয়ে দেয়ে নিই। তারপর বাসে চাপলাম, সীট পেলাম বেশ ভালোয় ভালোয়। এখান থেকে বাসে সময় নেবে প্রায় একঘণ্টা বকখালিতে পৌছাতে। এখানকার পেজের নাম হলো "মাইল"। যেমন, পাঁচ মাইল, সাত মাইল, দশ মাইল প্রভৃতি।

পৌনে বারটার সময় হাজির হলাম বক-খালিতে। বকখালীর লজের যিনি ইনচার্জ অর্থাৎ অশোক বোস, ওনার সাথে আমার একটু পরিচয় আছে, উনি আমাকে তাঁর ছোট ভাই হিসাবে দেখেন। অশোকবাবু বাস ষ্ট্যাণ্ডের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমাদের দেখতে পেয়ে সাদর অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন।

বকখালির লজ। সবুজ রঙের একখানা কাঠের বাংলো। তিন কামরা বিশিষ্ট এই লজ-

খানা। এখানে থাকার ব্যবস্থা, খাবার দাবার কোনরূপ ব্যবস্থা নেই। পাশে কিছু হোটেল আছে, সেখান থেকে খাবার-দাবার সারতে হয় লজের পাশে আছে ঝাউবন আর আছে বিশাল বঙ্গোপসাগর। এখানে দেখার ভেতর আছে ঝাউবন, ফরেষ্ট আর সমুদ্রের রূপলাবণ্য। আসলে আমরা এসেছি এখানে কয়েকদিন বিশ্রামের জন্যে। অশোকদার সাথে সুমিতের পরিচয় করে দিই। বললাম, "একেও আপনি আমার মত ভাই হিসাবে স্নেহ করবেন।"

অশোকবাবুকে দেখলাম বেশ তিনি খুশীখুশী ভাব, কারণ মনে হয় আমাদের পেয়ে। অশোকদার বাড়ী হলো কোলকাতার টালিগঞ্জের কুঁদঘাটেতে। চাকরির দায়ে তিনি এখানে বন্দী-জীবন যাপন করছেন। সত্যি এখানে দু' তিন ভালো লাগবে, বেশীদিন থাকলে বড়ই বোরিং বলে মনে হবে। যাহোক, মাত্র তিন-চারদিন থাকব বলে এসেছি।

লজের প্রতিটা ঘরে আটখানা করে বেড আছে। আমরা এক নম্বর ঘরখানাতে থাকব। আমাদের মত তিন-চারদিন থাকবে বলে এসেছে সাতটি ছেলে। অর্থাৎ সাত বন্ধু। ওদের সাথে আলাপ হতে জানতে পারা গেল ওদের নাম ধাম ও পেশা। থাকে, কোলকাতাতে দক্ষিণে চেতলা-নিউ আলিপুর অঞ্চলে। জানতে পারা গেল ওদের নামগুলো অতুল মিশ্র, ওরফে কুচাই, সোমনাথ মণ্ডল, গৌতম দাস, অশোক মণ্ডল, সঞ্জীব সান্যাল, সঞ্জয় দে ও শ্যামল পণ্ডিত। বয়সে সবাই কিশোর। পরীক্ষার পর এখানে বেড়াতে এসেছে। বেশ মজা হলো ওদের পাশে পেয়ে। বলতে গেলে ওরা কোলকাতাতে আমাদের পাশাপাশি থাকে। আমরা থাকি গোপাল নগরেতে। সুতরাং বলতে গেলে আমাদের পাড়ারই ছেলে ওরা সব। আমাদের পরের বাসে এসেছে, আমাদের মত ওরা এই লজে ভালো-ভাবে থাকার স্থান বুকিং করেছে। দেখা গেল, বেড যা আছে ঘরেতে, সে তুলনায় একজন বেশী। তখন একজনকে অন্য ঘরে চালান যেতে হয়। এখন আমি সমস্যার সমাধান করে দিলাম, বললাম সুমিত আর আমি একই বেডে শোব। তোমরা যে যার আলাদা আলাদা ভাবে শোবে। সবাই আমার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল। সমস্যা মিটে গেল। সবার আগে সোমনাথ আর গৌতম আমাদের সাথে আলাপ জমাতে এলো। সুমিত ওদের সাথে আমার পরিচয় করে দিল। আমার পরিচয় পেয়ে দেখলাম, ওরা বারংবার আমার আর সুমিতের দিকে বিস্ময় নেত্রে দেখতে লাগল। শেষে বেশ জমাটিভাবে ওদের সাথে আমাদের ভাব হয়ে গেল। ওরা ঠিক করল যে, যেখানে আমরা যাব ওরাও সেখানে যাবে, মোটামুটিভাবে আমরা যেভাবে চলব ওরা সে ভাবে চলবে বলে স্থির করল। আমার আপত্তি সত্বেও ওরা আমাকে ওদের দলনেতা নির্বাচিত করল।

সেদিন দুপুরে অর্ডার মত দুপুরের খাওয়া-দাওয়া করলাম, স্থানীয় গ্রাম্য হোটেলেতে যার পরিচিত

নাম—"অন্নপূর্ণা হোটেল।" ঠিক হলো ওরা সাত জন আর আমরা দুজন মোট এই ন' জন কোথাও যেতে গেলে এক সাথে যাব এক সাথে খাব ইত্যাদি। সেদিনের প্রোগ্রাম হলো, বিকেলের দিকে ঝাউবনে বেড়াতে যাওয়া তারপর ওখান থেকে সি-বিচে।

অশোকদার ডাকেতে আমাদের ঘুম ভাঙলো। রিষ্টওয়াচের দিকে চেয়ে দেখি, পাঁচটা বাজতে দশ। সুতরাং আমার নির্দেশে কুইক মার্চ করতে ওরা তৈরি হতে থাকে।

সাড়ে পাঁচটার সময় ন'খানা তাজা প্রাণ বেড়িয়ে পড়ল ঝাউবনের দিকে। সাথে সাথী হলো প্রকৃতির চিরনবীন মায়াভরা রূপখানা। বড়ই মনোরম। শীতের রাতে। সুনির্মল সুনীল আকাশে বিরাজ করছে ভরা পূর্ণিমার চাঁদখানা। প্রকৃতি তার উজাড়-করা রূপ দিয়ে সাদর আহ্বান জানাচ্ছে আমাদের। বিভোর আবেগ ভরা ন'টা প্রাণী চলতে থাকে রহস্যের হাতছানির জালের দিকে। যার বিরাম নেই ক্লান্তি নেই। চলচ্ছি স্বাধীনচেতার মনোবল নিয়ে। বাঁধনছাড়া কোমল হৃদয়কে বারবার দোলা দিতে থাকে প্রকৃতির রূপের পরশে। যেন মায়ার জালে বেঁধে দিতে চায় দানময়ী প্রকৃতি। বামদিকে প্রকৃতির এক হাত ঝাউবন তার ভেতর দিয়ে চলতে থাকি তার ডানদিকে তার আর এক হাত সমুদ্র, তার গর্জনের দ্বারা আমাদের বারংবার অভিনন্দিত করতে থাকে। বড়ই মধুর। বড়ই মনোরম দৃশ্য। ভোলা যায় না তারে। জ্যোৎস্নার প্লাবন যেন সারা ঝাউবন তথা এলাকাকে ভরিয়ে তুলেছে। আমেজভরা মৃদু উত্তরের হাওয়া আমাদের গরম রক্তের ভেতর এক সুখবার্তা বহন করে এনেছে যেন। যা আমাদের কাছে এক অভাবনীয় ভাবে দেখা দিয়েছে। কুচাই ভালো গান জানে। আমাদের তরফ থেকে সুমিত জানিয়ে দিলো আমার ভালো গান জানার কথা। সুতরাং, একে একে দুই হলো—ওদের তরফে একজন আর আমাদের তরফে একজন। আমার হাতে একখানা টর্চ ছিলো। যেটা আমরা কোনো রকম প্রয়োজনের জন্যে রেখেছিলাম। ঝাউবন দিয়ে যাত্রা সুরু হলো বেশ অনেকটা ঝাউবনের ভেতর দিয়ে যেতে থাকি। সবার অনুরোধে আনন্দে আত্মহারা কুচাই একখানা গান ধরল। বেশ ভালো লাগছিলো পরিবেশখানা।

…বেড়াতে বেড়াতে আমার টর্চের আলো ঠিক্‌রে পড়ল ঝাউবনের ভেতর কোন এক গর্তেতে। ঝাউবনের ঘনত্বটা বেশী থাকায় চাঁদের আলো সেখানে নামমাত্র গিয়ে পৌঁচেছে। যার ফলে টর্চের আলো বেশ গাঢ় লাগছিলো। মনে হলো সবে মাত্র গর্তখানা খুঁড়ে আবার বুজিয়ে দেয়া আছে আল্‌গা ভাবে। যতদূর মনে হয় দু-তিন মিনিট আগে হবে। আমার রহস্যানুসন্ধানী চোখখানা বেশ জ্বলজ্বল করতে থাকে। মনের ভেতর হঠাৎ সন্দেহের হাওয়া বইতে থাকে। তখনকার মতো কাউকে কিছু না বলে ওদের বুঝতে না দিয়ে সোজা ওদের মতো বেড়াতে থাকি।

এমন কি আমার অতি প্রিয় বিশ্বাসী সহকারী

সুমিতকেও পর্যন্ত জানাইনি না। সবার পেছনে পেছনে আমি আর সুমিত যাচ্ছিলাম। যখন গর্তের কাছাকাছি ছিলাম তখন সুমিত একটু আমার চেয়ে এগিয়েছিলো। সেই সময় গর্তের সন্ধান পাই, টর্চ মেরে সাময়িক পরীক্ষা করে ফেলি চোখের নিমিষে। কেউই টের পেল না। জানিনা অজানা সন্দেহ আমার মনের দুয়ারে বারং বার ধাক্কা দিতে থাকে। একটু-পিছিয়ে পড়তে দেখে সোমনাথরা সামনে দেখি দাঁড়িয়ে পড়েছে, অপেক্ষা করতে থাকে আমাদের জন্যে। যখন ওদের কাছে গেলাম তখন গৌতম আর অশোক প্রশ্ন করল, "কি ব্যাপার পিছিয়ে পড়লে যে? জবাব দিলাম, একটু ওদিকে দেখছিলাম কিনা, তাই।" যাহোক এ নিয়ে কেউ আর উচ্চবাচ্য করল না। আবার চলতে শুরু করলাম.....

ঝাউবনের পথ ধরে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেলাম আমাদের লজ্ থেকে। ঝাউবনের পাশেই মহাসমুদ্র। ঝাউবন ছেড়ে চলে এলাম সমুদ্রের সি-বিচেতে। জ্যোৎস্নার আলো পড়ে সি-বিচ্-খানা মনে হতে লাগল যেন শ্বেত পাথরের পাতা সীমাহীন রাস্তা। চারদিকে নির্জন নির্জন। এমন সময়—সঞ্জীব, শ্যামল, কুচাই, সোমনাথ আর গৌতম ধরল আমাকে যে, একখানা গান গাইবার জন্যে। প্রথমে রাজি হচ্ছিলাম না। শেষে সুমিতের দিকে তাকাতেই দেখলাম, ওদের মত সুমিতের ইচ্ছা একখানা গান যেন গাই। অবশেষে সবার অনুরোধে একখানা গান আমাকে গাইতে হলো।

রাত্রি সাড়ে দশটায় আমরা লজে ফিরে এলাম। নানা চিন্তার জাল আমার মাথায় ঘুরতে থাকে। আমার আবভাব দেখে সুমিত খানিকটা ধারণা নিতে সক্ষম হয়েছে এই ভেবে নিশ্চয়ই কোন রহস্যের গন্ধ আমার নাকে গেছে। সবার সবার আড়ালে সুমিত কথাটা পাড়ল। তখন ওকে ইশারায় বোঝালাম, এখন নয়, পরে বলব। যথারীতি খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই শুতে গেলাম সুমিত আর আমি একসাথে ফিস্ফিস্ করে আমার কথাটা পাড়লাম। আমার কাছে শোনার পর দেখলাম, ওর চোখমুখ বেশ খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নতুন অজানা রহস্যের জাল ছিন্ন করবার জন্যে ওর হৃদয়খানা দুলতে থাকে।

রাত তখন বারটা। শীতের রাত। নিঝুম নিশুতি রাতখানা। চাঁদের আলোয় যতদূর দেখা যায়. নিবিড় নির্জন যেন কোন ঘুমন্ত পুরী। কোন রাতজাগা অজানা এক পাখী আর্তনাদ করতে করতে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

চুপি চুপি আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম দুটো তাজা প্রাণ রহস্য-অনুসন্ধানের আশায় ঝাউ বনের দিকে। একমাত্র সাক্ষী রইলো পূর্ণিমার চাঁদখানা। ঝাউ বনের পথ ধরে চলতে লাগলাম গত রাত্রের নির্দিষ্ট সেই গর্তের কাছে। ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দ আর ক্রমাগত ঢেউএর পাড় ভাঙা শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছিল না। যেখানে আমরা প্রবেশ করলাম ,সেখানে বনের ঘনত্বটা একটু বেশী। তারপর পূর্বের রাত্রের উল্লেখিত গর্তের কাছাকাছি

এলাম। টর্চের আলোয় গর্তখানা চোখে পড়ল। আমার নির্দেশে সুমিত সাবল দিয়ে গর্তটা খুঁড়তে থাকে। কিছুক্ষণ খোঁড়ার পর আবিষ্কৃত হলো একটি মৃত মানব দেহ। তারপর যত্ন সহকারে সম্পূর্ণভাবে খুঁড়ে বার করা হলো। হঠাৎ দেখা গেল একটা কাগজ ভাঁজ করে পড়ে আছে। সেটা সযত্নে আমার পকেটে রাখলাম। দেখলাম, বুলেটের আঘাতে হতভাগ্যের বুকখানা ঝাঁজরা হয়ে গেছে। বয়স গোটা চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হবে। প্রাথমিক পরীক্ষার পর শব দেহখানা আবার গর্তে চাপা দিয়ে রাখলাম, যেমন আগে ছিলো সেরকম ভাবে। আমার অনুমান কতটা সত্য দেখে সুমিত রীতিমত বিস্মিত হয়ে পড়ল। আবার সে পুনরায় আমাকে নতুন ভাবে চিনল।

লজে এসে সোজা অশোকদার ডেরায় চলে এলাম। তারপর ডাকাডাকি করে ঘুম ভাঙিয়ে সংক্ষেপে সবিস্তারে সব বললাম যা যা ঘটেছে। তারপর অশোকদার কাছে পুলিশের ফাঁড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করলাম। অশোকদার উল্লেখ মত গভীর রাত্রে ছুটলাম স্থানীয় সেই পুলিশ ফাঁড়ির সন্ধানে। যথারীতি পুলিশ ফাঁড়িতে এসে আমার উদ্দেশ্য কি সবিস্তারে বললাম অফিসার ইন চার্জকে। অফিসার ইন চার্জ অর্থাৎ বড়বাবু তন্ময় চ্যাটার্জী একজন জাঁদরেল নামকরা লোক। তাঁর এলাকায় এরকম খুন হয়েছে জেনে রীতিমত আশ্চর্য হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, তাঁর সময়ে এসব কেস এখানে হয় না বললেই চলে। যাহোক, তিনি চার-পাঁচজন সিপাহী সহ ঘটনা স্থলে আমাদের সাথে গেলেন। তখন কটা প্রাণী ব্যতীত সমগ্র বকখালীর কানে এখবরটা পৌঁছাইনি। যথা সময়ে তন্ময়বাবু তাঁর দলবল নিয়ে হাজির হলেন। সাথে রইলাম আমি, সুমিত আর অশোকবাবু। তন্ময়বাবু দুজন হাবিলদারকে ডেড্‌বডি বার করবার জন্যে বললেন। হাবিলদার—নাড়ু সিং আর অরু সিং যথা আদেশ পালন করতে লাগল। আর দুজন হাবিলদার কুমারবাহাদুর আর চন্দনবাহাদুর পাহারা দিতে থাকে। বডি যখন বার করা হলো তখন উপস্থিত তন্ময়বাবু আর অশোকবাবু সনাক্ত করলেন এযে রামগোপালবাবুর দেহ। রামগোপাল বাবু। স্থানীয় একটা মাঝারী ধরণের হোটেলের মালিক। অতিকষ্টে মেহনত দিয়ে তিনি হোটেলটা তৈরী করেছিলেন। সংসার বলতে তার বিধবা বৃদ্ধা মা আর একটা ভাই জীবনগোপাল। রামগোপালবাবুর হোটেলের নাম "সুহাসিনী হোটেল।" রামবাবু তার মায়ের নামে হোটেলের নামকরণ করেছিলেন।

তন্ময় বাবুর নির্দেশে বডি ময়না তদন্তের জন্যে নিয়ে যাওয়া হলো। সময়টা তখন রাত দুটো। সুতরাং এত সব কাণ্ডকারখানার কথা এরা ছাড়া কেউ জানতে পারল না।

বডি চলে যেতেই তন্ময়বাবু আমার সাথে পরামর্শ করতে লাগলেন। কিভাবে কি প্রক্রিয়ায় খুনীকে ধরা যায়? সুমিত তখন বলল, "যদি আমাদের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেন তাহলে একবার চেষ্টা করতে পারি। কি যেন একটু ভাবলেন তন্ময়বাবু। তারপর আমার হাত ধরে বললেন,

"তুমি ভাই, এ দায়িত্বখানা নাও, আমার দ্বারা এর কিনারা করা কোন মতে সম্ভবপর নয়।" এখানে বলা প্রয়োজন, যখন তন্ময়বাবুর সাথে দেখা করতে যাই প্রথমে, তখন আমার পরিচয়খানা জানিয়েছিলাম। তারপর তিনি বললেন, তোমাকে খুনী বার করে দিতেই হবে। খুনীকে বার করে দিয়ে তুমি আমার মান-সম্মান বাঁচাও। তন্ময়-বাবুকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, "বেশ, আপনি যখন আমার উপর দায়িত্ব অর্পণ করছেন, তখন আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব। যাতে খুনীকে ধরে আপনার হাতে তুলে দিতে পারি। তবে হ্যাঁ, আমার যখন যা প্রয়োজন হবে আশা করি সব রকম সাহায্য এবং সহযোগিতা আপনাদের কাছ থেকে পাব।" আমার কথাখানা লুফে নিয়ে তন্ময়বাবু বললেন—"নিশ্চয়ই পাবে, সে আর বলতে। তোমার যা যখন দরকার পড়বে তা সাথে সাথে পাবে।"

তন্ময়বাবুর কাছ থেকে দায়িত্ব পাবার পর আমি আর সুমিত লজেতে চলে এলাম। অবশ্য অশোকদাকে আগেই চলে যেতে বলেছি। উনি আমাদের পূর্বে চলে গেছলেন। সেখানে তিনি আমাদের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন।

লজে গিয়ে অশোকদাকে সব জানালাম আমার সাথে তন্ময়বাবুর কি কি কথাবার্তা হয়েছে। উনি আমাকে যে দায়িত্বখানা অর্পণ করেছেন তাও পরিশেষে জানালাম। অশোকদাকে কয়েকটা মামুলী প্রশ্ন করে ওনাকে বিশ্রামের জন্যে চলে যেতে বললাম। উনি চলে যেতেই সুমিত আর আমি বিছানায় বাকী রাতটুকু কাটাবার জন্যে নিদ্রা দেবীর কোলে ঢলে পড়লাম।

সঞ্জীব আর অশোকের ডাকে যখন ঘুম ভাঙল তখন ঘড়ির কাঁটাটা ঠেকেছে পৌনে আটটার ঘরে। খোঁজ নিয়ে জানলাম অশোকদার তখনও মধ্যরাত্রি। অর্থাৎ ঘুমোচ্ছেন। গত রাত্রে যা যা ঘটনা ঘটেছে তা আস্তে আস্তে মনে পড়তে থাকে। সুমিত এতক্ষণ রেডি হয়ে বসে পড়েছে আমার নির্দেশের অপেক্ষায়। আমার নির্দেশে সুমিত সবাইকে অর্থাৎ—কুচাই, সোমনাথ, গৌতম, সঞ্জীব, অশোক, শ্যামল আর সঞ্জয়দের জড়ো করলো আমার বিছানার চারপাশে। সংক্ষেপে জানালাম, গত রাত্রের যাবতীয় ঘটনাগুলো। সব শুনে ওরা যেমন বিস্মিত হলো তেমনি নতুন রহস্যের গন্ধে মনকে সতেজ, সজাগ করে তুলল। বারংবার ওরা আমার দিকে অবাক নেত্রে তাকাতে থাকে। সব বলার শেষে ওদের শুধু বললাম—"এখন আমাদের কাঁধে বিরাট দায়িত্ব এসে পড়েছে, সুতরাং আমরা কোলকাতার ছেলেরা যেন ভুলে না যাই,—আমাদের আত্ম সম্মানের কথা। যতক্ষণ না এই খুনের কূলকিনারা আবিষ্কার করতে পারছি ততক্ষণ কোলকাতায় ফিরব না।" সবাই তার স্বরে চিৎকার করে উঠল—"তুমি আমাদের দলনায়ক। যে ভাবে আমাদের চালাবে, সেইভাবে চলব।" সবাইকে সাবধান আর সতর্ক করে দিয়ে বললাম, "তোমরা এ নিয়ে কোন আলোচনা করো না। কারণ খুনী আমাদের আশে-পাশে কোথাও না কোথাও আছে।" টের পেলে সাবধান হয়ে

যাবে। সবাই আমার নির্দেশে চুপচাপ হয়ে গেল। যাবার সময় বলে গেলাম, "এ বিষয়ে তোমরা কোন আলোচনা করো না। আমি আর সুমিত একটু তন্ময়বাবুর সাথে দেখা করে আসি। সূত্র যা পেয়েছি আশা করি, আজ রাতের ভেতর খুনীকে ধরে ফেলতে পারব।

রামগোপালবাবুর আস্তানায় গেলাম, তন্ময়-বাবুর সাথে দেখা করে। সাথে এলেন তন্ময়বাবু। আমার নির্দেশে সুমিত গেল নামখানায়। আসতে সময় লাগবে, দশটা এগারটা হবে।

প্রথমে জেরা সুরু করলাম রামগোপালবাবুর বৃদ্ধা বিধবা মাকে দিয়ে। তিনি কয়েকদিন ধরে ছেলের সন্ধান না পেয়ে কেমন যেন মুষড়ে পড়েছেন। যখন আজ সকালে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পেলেন তখন অনুমের ছেলে হারানোর শোক বৃদ্ধাকে কেমন আঘাত হেনেছে। বড়ই করুণ সে দৃশ্য। বারবার তিনি মূর্ছা যাচ্ছেন। তারপর রামগোপালবাবুর ছোট ভাই জীবনগোপালকে জিজ্ঞেস করলাম। দেখলাম, রাফ্-টোনে সে আমাদের সাথে কথা বলতে থাকে। তন্ময়বাবুর রুমের গুঁতোয় হুশ ফিরে পেল। চেয়ে দেখে পুলিশ। কেমন যেন ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে গেল। বয়স গোটা পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। প্রশ্ন করলাম অনিচ্ছা সত্বেও "তোমার নাম কি?" রূঢ়ভাষায় কথা বলল, "মা বাবা নাম দিয়েছেন, 'জীবনগোপাল' বলে। দ্বিতীয় প্রশ্ন "কাজ কি করো?" হাত নাড়িয়ে বলল, ভবঘুরে বেড়াই, দাদার হোটেলে খাই, মার কোলে ঘুমাই। একে আর প্রশ্ন করা বৃথা মনে করে ছেড়ে দিলাম। তারপর তন্ময়বাবুর উদ্দেশ্যে বললাম, "একে নজরবন্দী করে রাখুন।" তারপর হোটেলের কর্মচারীদের একে একে জেরা করলাম, একের পর এক। যখন বুঝতে পারলাম, কিছু হবে না তখন ছেড়ে দিলাম। একমাত্র জীবনবাবুর উপর আমার সন্দেহ হতে লাগল। সুমিতকে যে উদ্দেশ্যে নাম-খানায় পাঠিয়েছি সেটা যদি সফল হয় তাহলে আজ দুপুরের ভেতর খুনীকে ধরে ফেলতে পারব।

সমস্ত জেরা শেষ হবার পর লজে ফিরে এলাম। রামগোপালবাবুর দেহের পাশে যে চিরকুটটা পাওয়া গেছে সেটা বেশ ভালোভাবে পরীক্ষা করতে থাকি। তারপর মনযোগ দিয়ে পড়তে থাকি। পড়ার পর আমার মুখখানা খুশীতে বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। গৌতমদের খাওয়া-দাওয়া করতে বলে দিলাম। এমন সময় সুমিতের আবির্ভাব। ওকে যে উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলাম, তা সম্পূর্ণ সফল। অর্থাৎ আমার যা অনুমান ছিলো তা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। তারপর সুমিত আর আমি স্নান করে খাওয়া-দাওয়া করে বিশ্রাম নিতে থাকি। সঞ্জয়দের বললাম, "তোমাদের নিয়ে আজ আমাদের সাথে মিলিতভাবে চলবে নামখানার অভিযান। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সুমিত আর আমি বেরিয়ে পড়লাম তন্ময়বাবুর উদ্দেশ্যে। ওনাকে সমস্ত নির্দেশ দিয়ে বেলা আড়াইটের ভেতর চলে এলাম। সুমিতকে বললাম আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোকে রেডি করে রাখতে। তারপর সুমিত আর আমি

বিশ্রাম করতে লাগলাম।

সেদিন সন্ধ্যাতে। সময়টা হলো সাড়ে ছ'টা। আমরা ন'জন ছাড়া তন্ময়বাবু আর তার বেশ কিছু-সংখ্যক সাদা পোষাকের পুলিস সহ রওনা দিলাম নামখানাতে। সুমিতের চোখে-দেখার স্থানে আমরা ঘণ্টা খানেকের ভেতর পৌঁছে গেলাম। দেখলাম, নামখানার নিকটে কোন একস্থানে সেখানে একটা পোড়ো বাড়ী। সেই বাড়ীটাকে পুরো সাদা পোষাকের বাহিনী।

আমি আর সুমিত পোড়ো বাড়ীর দরজার কাছে হাজির হলাম।

.....ভেতরে ভেসে আসছে নানা রকম হৈ-চৈ-এর আওয়াজ আর চাপা হিন্দী ছবির গান। যখন আমরা প্রবেশ করলাম তখন আমাদের হাতে রয়েছে উদ্যত মরণ অস্ত্র—স্বয়ংক্রিয় দুটো রিভলবার। গৌতমদের সারি সারি দাঁড় করে রেখেছি নদীর ধারেতে।....আচমকা আক্রমণ করে পুরো গ্যাংটাকে পাকড়াও করলাম। পাশেই তন্ময়বাবু রেডি হয়েছিলেন তিনি বিনা দ্বিধায় তার বাকী কাজটুকু সম্পন্ন করলেন। বন্দীদের ভেতর দেখা গেল রামগোপালবাবুর ভাই জীবনগোপালকে। বাকীরা সব এক একজন কুখ্যাত দাগী আসামী। সবাইকে ধরে থানায় নিয়ে যাওয়া হলো।

তন্ময়বাবুর সামনে হাতকড়ি পরারত জীবন গোপালের সামনে বলতে থাকি কিভাবে খুনীকে সনাক্ত করতে পারলাম। অবশ্য কুচাইদের দলও সেখানে উপস্থিত।

কিভাবে খুনীকে ধরলাম বলতে তার কাহিনী খুবই সংক্ষিপ্ত তাই সংক্ষেপে বলতে থাকি।

সেদিন গর্তের কাছে আমি টর্চ ফেলে দেখতে পেলাম গর্তখানা আজই খোঁড়া হয়েছে। তখনই আমার মনে একটা খট্‌কা লাগল। তারপর সেদিন রাত্রে আমার প্রিয় সহকারী সুমিতকে বিস্তারিত ভাবে সব ঘটনা বলতে থাকি। সাথে সাথে আমাদের প্ল্যান প্রোগ্রাম রেডি করে ফেললাম।

সেদিন গর্ত খুঁড়ে বডির সাথে পাওয়া গেল এক টুক্‌রো চিরকুট। সবার সামনে সেটা মেলে ধরলাম। এটার সাহায্যে এত দ্রুতগতিতে এই রহস্যের সমাধান করে ফেললাম। এটা একটা নির্দেশিত পত্র। পত্রলেখক হলেন জীবনবাবু। তিনি অসৎ সংগে পড়ে নিজের বিবেকবুদ্ধি হারিয়ে ফেললেন। লোভ হচ্ছে মানব জীবনের পতনের কারণ। পিতৃতুল্য দাদাকে হত্যা করে হোটেলের মালিক হবার বাসনা জাগল তাই না জীবনবাবু? অপর প্রান্তে নিরুত্তাপ দেখে বলতে থাকি—তারপর সেই হোটেলের মালিক হয়ে এইসব সাঙ্গ-পাঙ্গদের আশ্রয় দেওয়া। ওপরে থাকবে হোটেল; ভেতরে ভেতরে চলবে চোরাইমালের আড়ৎ। বৃদ্ধা মাকে সরিয়ে দিতেন কিন্তু কি ভেবে তা করলেন না। বৃদ্ধা পুত্রশোকে পাগল হয়ে পড়বে এবং একদিন চলে যাবে। সেখানে কোন ঝামেলা নেই অবশ্য জীবনবাবু এই চোরাই মালের আড়ৎ গড়বার জন্যে দাদাকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। দাদা সে প্রস্তাব ঘৃণার সাথে সরাসরি নাকচ করে দিয়েছিলেন। তখন একমাত্র রাস্তা--দাদাকে হত্যা করে পথ থেকে কাঁটা সরানো।

হাঁকু-হাঁকু
গর্দভের মিষ্টি কাঠে আকৃষ্ট হ'য়ে পুলিশ সাহেব অজয়ের বাবার কাছে এগিয়ে এলেন।
!
এটা কি মোকদ্দমার আসামী?
আজ্ঞে, চুরি এবং ট্রেসপাস্। একজনের জমিতে ঢুকে পাকা ধান খেয়েছে। তদন্তটা শেষ করেই ৩৭৯ এবং ৪৫৪ ধারায় চালান দেব।
ওঃ!
দারোগাবাবু তো আকাশ থেকে পড়লেন। গাধার ব্যাপারে কিছুই জানেন না। কিন্তু চট করে সামলে নিলেন।
পুলিশ সাহেবের লগু চলে যেতেই দারোগাবাবুর হাঁকডাক শোনা গেল।
এই, ইধার আও কিষ্কিন্ধ্যা সিং, গন্ধমাদন পাঁড়ে। কেয়া বেয়াকুফকা কাম হ্যায়?
৯

চলবে

গন্ধমাদন পাঁড়ে আর কিষ্কিন্ধ্যা সিং হাজির। এবার দারোগাবাবু জানতে পারলেন 'বেয়াকুফ' আর কেউ নয়—
তাঁরই শ্রীনন্দন অজয় কুমার। ফলে ডাক পড়ল অজয়ের।
ব্যাটা, উজবুক, চাকরিটা খেয়েছিলি আর কি! ভাগ্যিস ফস ক'রে বুদ্ধিটা জোগালে। কোথায় পেলি ওটাকে? বল, শীগ্গীর।
বাবার বকুনির চোটে অজয় সব ফাঁস করে দিল। নগেশদার নামে একটু বেশী ক'রে বলল।
বটে, আমার সঙ্গে চালাকি! সব ব্যাটাকে ধারায় চালান করব। ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখ নি? আভি নিকাল দাও গন্ধমাদন পাঁড়ে, পিছসে ডাণ্ডা মারকে নিকাল দাও।
১০

চলবে

হুকুম পেয়েই গন্ধমাদন পাঁড়ে ডাণ্ডা নিয়ে ছুটল গাধাকে বিদায় করতে।
দিন সাতেক পর— দারোগাবাবু মফঃস্বল যাবার জন্য ঘোড়ায় উঠতে যাবেন, এমন সময় ইউনিয়ন বোর্ডের এক চাপরাশী সেই গাধাটা নিয়ে উপস্থিত। সেলাম ঠুকে একখানা কাগজ হাতে দিল।
দিন-পাঁচেক হালদাররা খে দিয়েছিল। হুজুরে... জিনিস
জানতে পেরে নিজেই নিয়ে এসেছি।
১১

চলবে


কাগজখানা হাতে নিয়েই দারোগাবাবুর চক্ষু চড়কগাছ! এ যে সাতটাকা সাড়ে এগার আনার একটা বিল।
নেহী লেগা। উ গাধা হামারা নেহি হ্যায়। ভাগো হিঁয়াসে
আজ্ঞে, আপনার জেলের মানেই আপনার। খোকাবাবুর কপালের জোর আছে। চার পয়সায় এমন একটা জলজ্যান্ত গাধা-
চাপরাশীর বক্তৃতা শুনেই দারোগাবাবু ঘোড়ার গদিটা নিয়ে তাড়া করলেন।
কিন্তু টাকাটা শেষপর্যন্ত দিতে হ'ল। সরকারী খোঁয়াড়। না দিয়ে উপায় কি?
১২

চলবে

Regd No. R. N. 32660/77 CAILDREN'S DETECTIVE (July/August) Rs. 1/50 WB/SC-1

চিলড্রেন্‌স্ ডিটেক্‌টিভ-এর

# ফেলুদা সংখ্যা নিয়ে হৈ হৈ !

## দ্বিতীয় মুদ্রণ বেরুলো বলে ?

"ছাপা, লে-আউট, লেখা সব মিলিয়ে এটা অভিনব প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই। ফেলু মিত্তিরকে নিয়ে বাংলাদেশে এরকম সংখ্যা বেরিয়েছে বলে জানা নেই। এ ব্যাপারে সম্পাদক মহীন্দ্র বসু অবশ্যই কৃতিত্বের দাবি জানাতে পারেন।"

দৈনিক বসুমতী ১৭ই চৈত্র ১৩৮৬

"এ দেশে সম্ভবত এই প্রথম হাল আমলের একটি লোকপ্রিয় চরিত্র ঘিরে প্রায় একশ পৃষ্ঠার একটি পত্রিকা বেরুলো। কিঞ্চিৎ ভুল-ত্রুটি সত্ত্বেও আপাতত সম্পাদককে সাধুবাদ।"

আনন্দবাজার পত্রিকা | ১৮ই চৈত্র ১৩৮৬

"ফেলুদাকে যারা ভালোবাসে তারা এই বিশেষ সংখ্যাটিকেও না ভালোবেসে পারবে না।"

যুগান্তর | ৫ই বৈশাখ ১৩৮৭

এর চলচ্চিত্র বিভাগে আছে : ফেলুদা স্রষ্টা সত্যজিৎ রায়ের ফিল্ম তৈরির উপর দু দুটি প্রবন্ধ আর "সোনার কেল্লা" ও "জয় বাবা-ফেলুনাথ" চিত্রনাট্যের বাছাই করা কিছু অংশ ; ফেলুদা ওরফে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের ছড়া ও সাক্ষাৎকার ; সিদ্ধার্থ ( তোপ্‌সে ) চট্টোপাধ্যায় এবং সন্তোষ ( জটায়ু ) দত্ত-র দুটি বড় লেখা। এছাড়া "সোনার কেল্লা"-র 'মুকুল' কুশল চক্রবর্তী ও "জয় বাবা ফেলুনাথ"-এর 'রুকু' জিৎ বোস ত আছেই।

ফেলু সাহিত্য নিয়ে কলম ধরেছেন : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, পূর্ণেন্দু পত্রী, প্রফুল্ল রায়, প্রণবেশ চক্রবর্তী, তারাপদ রায়, প্রণব মুখোপাধ্যায়, এবং নবনীতা দেবসেন।

দেশ পত্রিকা সম্পাদক সাগরময় ঘোষ লিখেছেন ফেলুদার পুজো সংখ্যা আলোড়ন সম্পর্কে আর ফেলুদা বই প্রকাশনার উপর বলেছেন আনন্দ পাবলিশার্স এর দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।

দ্বিতীয় মুদ্রণের সংখ্যা সীমিত ;

কাজেই

ছবিতে ভরপুর জমজমাট এই বিশাল সংখ্যাটি ফুরিয়ে

যাবার আগে কিনে ফেলার এই শেষ সুযোগ !

দাম : মাত্র ৬ টাকা !

সম্পাদক মহীন্দ্র বসু কর্তৃক ২৮ হ্যাণ্ড রোড, কলিকাতা-৭০০০০১ হইতে প্রকাশিত, শ্রীসত্যনারায়ণ প্রেস ৪২এ, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬ হইতে মুদ্রিত।